অভিনয়ের নায়ক

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

গ্রন্থ-নিলয়
৪৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

হরপ্রসাদ ও মুকুলকে

এই লেখকের

কন্তকা ॥ পিপাসা ॥ দুই দ্বীপ ॥ দৃশ্য, দৃশ্যান্তর ॥ ডিরোজিয়ো

গলিটা অনেকবার ডান-বাঁ ক'রে একটা প্রান্তদেশে এসে যখন শ্রান্ত ও শীর্ণ, তখন গোলাপের রাজপ্রাসাদের দেখা পাওয়া যায়। ছোট একটি দোতলা প্রৌঢ় বাড়ী—কর্পোরেশনের হোস-পাইপের জল-আলিঙ্গনে সমতলে শায়িত হবার মতো বার্ধক্য আজও অনাগত, তবে তার আগমনীর সুর প্রৌঢ় হাড়-পাঁজরের মধ্যে বাজতে সুরু করেছে। ঐ হাড়ের ওপরে মাংস লাগবার মতো খাদ্য বরাদ্দ করে না বাড়ীওয়ালা, পাঁচ-সাত বছর পরে হঠাৎ একদিন সুমতি হ'লে পাঁজরের ওপরেই চুনের জল বুলিয়ে দিয়ে যায়; সেই জ্যালজেলে পাঞ্জাবির না আছে পরিচ্ছদ-শ্রী, না আছে কুশ্রী কঙ্কালটাকে ঢাকবার ক্ষমতা। দেখতে হয় অদ্ভুত—অনেকটা সেইজাতীয় বরের মতো, যারা নিমতলা যাওয়ার পথে ছাঁদনাতলায় একবারটি থেমে যায়। তারাও যেমন বর, এও তেমনি রাজপ্রাসাদ; যে মানুষের অন্তরে বিয়ের সক্রিয় বাসনা, সে বর; আর যে ঘরের অন্দরে রাজার আস্তানা, তাই রাজপ্রাসাদ।

এখানেও একজন রাজা থাকে—একতলার ভাড়াটে সে। 'রাজপ্রাসাদ' নামটা দেওয়া দোতলার ভাড়াটে ভবন-দাদুর। গোলাপের 'রাজা' খেতাবটাও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। যাত্রাদলে কাজ করে গোলাপ, তাই। ভবানীবাবু চাকরিতে রিটায়ার করবার পর নিতান্ত বেকার হবার আশঙ্কায় পরোপকারে মন দিয়ে পাড়ার ভবন-দাদু নামে খ্যাত হয়েছেন। তাঁর আত্মীয়-ব্যবহার গোলাপের পক্ষে সুবিধের হয়েছিল—এ বাড়ীতে আসার প্রথম দিন থেকেই। যাত্রাদলের সঙ্গে তাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়, তখন ভবন-দাদুই এ বাড়ীর কর্তা। গোলাপ আর সাগরীর আটটা বছর কাটল এই প্রাসাদে।

সন্ধ্যেবেলা। রাজা প্রাসাদে ফিরছিল। বাঁ পাশে রুনু, ডান হাতের তর্জনী আঁট ক'রে ধরে ঝুনু। দুই মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল গোলাপ। কোলকাতায় থাকলে প্রায়ই বের হয়। আগে খোকনও থাকত সঙ্গে—তাদের প্রথম সন্তান। কিন্তু সে এখন নেই।

'বাবা, ঠাণ্ডা।' বললে ঝুনু, ছোট মেয়ে।

'কী ঠাণ্ডা ?'

ঝুনু তার হাতটা তুলে দেখালে। অর্থাৎ একটু আগে খাওয়া আইস-ক্রীমের ঠাণ্ডা এখনও তার হাতে লেগে আছে।

'গালটা নামাও, বাবা।'

গোলাপ মুখটা নীচু করতে ঝুনু ওর কচি হাতটা গালের ওপর রাখল। খুশীর উচ্ছ্বাসে বললে, 'কী ঠাণ্ডা, বাবা!'

'খুব ঠাণ্ডা তো।···এবার তাড়াতাড়ি চল।'

রুনু বললে, 'বাবা, তুমি বুঝি আজ বাইরে যাবে ?'

'হ্যাঁ রে, তাইতো তোদের তাড়াতাড়ি যেতে বলছি।'

গোলাপ ওকে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, আমি যখন থাকি না, তখন আমার জন্যে তোদের খুব কষ্ট হয় ?'

রুনু বাবার কোল ঘেঁসে পথ চলতে লাগল, কোন জবাব দিলে না।

ঝুনু আপন মনে হাতটা নিজের গালে বসাচ্ছে আর তুলছে—এদিকে কান নেই তার।

গোলাপ আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কিরে, রুনু ?'

'না বাবা, কষ্ট কি !'

এইটুকু বয়সেই মেয়েটা কেমন নিজেকে গোপন করতে শিখেছে। খোকন কিন্তু এমন ছিল না—গোলাপের কাপড় মুঠোয় ক'রে ঘুমোত, পাছে ঘুমের মধ্যে চলে যায়। রুনু-ঝুনু খোকনের তুলনায় অনেক শান্ত। খোকনের দুরন্তপনায় সারা বাড়ী অস্থির ছিল। সেই দুরন্ত প্রাণশক্তিকে দেখে গোলাপের নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত ! ছোটবেলায় গোলাপও ছিল অমনি। ছোটবেলা কেন, বেশ বড় হওয়া অবধিই—বিয়ের পর থেকেই সে যেন কেমন স্তিমিত হয়ে গেছে ! বিয়ের পরে অবশ্য সবারই পরিবর্তন হয়, কিন্তু তার বদ্‌লে যাওয়াটা—

'বাবা, বাড়ী।' ঝুনু গোলাপের হাত ধরে জোরে টান দিল।

'হুঁ, চল।'

বাড়ীতে এসে দেখলে, বসন্ত এসে বসে আছে। বন্ধু, সহকর্মী ও সাগরীর মাসতুতো ভাই—একাধারে এতগুলো পরিচয় বসন্তের।

গোলাপ জিজ্ঞেস করলে, 'তোর শরীর এখন কেমন ?'

'খুব সুবিধের নয়। তবে তোদের সঙ্গে এবার বেরুচ্ছি। দাসমশাইর সঙ্গে কথাবাতা ব'লে এসেছি।'

বসন্ত কিছুদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল, কাজ বন্ধ ছিল তার—এবার আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

গোলাপ বললে, 'তোর শরীরটা এখনও কিন্তু খারাপ দেখাচ্ছে।'

'তা হোক, এদিকে যে হাঁড়ী ঠনঠন।' অকস্মাৎ অভিনয়ের ঢঙে বলতে সুরু করল :

'পুনরায় যাইব রণে
কেহ না পারিবে রোধিতে।
শত্রুসেনা এসেছে কাতারে কাতারে,
ঘিরেছে আমার নগর পঙ্গপাল সম,
কেমনে রহিব ঘরে বীরশ্রেষ্ঠ আমি।
দেহ মাতা, দেহ অনুমতি।'

গোলাপ বললে, 'থাম্।'

মেয়ে দুটি বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে বসন্তর দিকে তাকিয়ে ছিল। সেটা লক্ষ্য ক'রে বসন্ত বললে,

'কি দেখিছ বালিকা, অমন ছানাবড়া চোখে ?
খাইবে লবেনচুস ? আইস এদিকে
প্রচণ্ড অশ্ব-সম বেগে— ।'

বসন্ত পকেট থেকে লজেন্স বার করল, এবং ঝুনু মাতুল-আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে প্রচণ্ড অশ্বসম বেগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রুনুর রসনা সিক্ত হলেও সে দাঁড়িয়েই রইল।

প্রচণ্ড-অশ্ব ঝুনুর মুখে লজেন্সের লাগাম পরিয়ে বসন্ত রুনুকে ডাকলে, 'এসো সাগর-ছেঁচা মাণিক, এগিয়ে এসো।'

রুনু সলজ্জ-হাসি হেসে এগিয়ে আসে : 'দাও।'

বসন্ত ওকে চটাবার জন্যে ওর হাতের ঠিক নাগালের বাইরে উঁচুতে লজেন্সটা ধরে রাখে। রুনু দু'-একবার চেষ্টা করে : 'বা রে, দাও না।'

বসন্ত বলে, 'নে না।' কিন্তু হাত নামায় না ওর নাগালের মধ্যে।

চটে ওঠে রুনু : 'চাই না, চাই না আমি।' অভিমান-ক্ষুব্ধ রুনু ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

'অ্যায় ভাখো, কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। জিভের জল এখন চোখের জলে পরিণত। আর আমার এদিকে নাকের জলে চোখের জলে হ'তে হবে।' বসন্ত ছুটল ওর পিছু-পিছু। 'ওরে সাগর-ছেঁচা মাণিক—'

ঝুনু জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, কি হ'ল ?' এতক্ষণ সে নিজের লজেন্সে গভীর মনোযোগ দিয়ে বসে ছিল।

'দিদি রেগে গেছে।'

'ও।' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে কথাটুকু ব'লে লজেন্সে মন দিল।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর রুনুকে লজেন্স গছিয়ে বসন্ত ঘরে ফিরে আসে। 'উঃ, সাগর-ছেঁচা মাণিক না হাতী। একেবারে গোলাপের কাঁটা। এঃ, দেরী হ'য়ে গেল। আমি চলি রে, গোলাপ। স্টেশনে দেখা হবে।'

পেছনে সাগরী এসে দাঁড়িয়েছিল ; বললে, 'তুমি এখানেই দুটি ভাত খেয়ে নাও না, বসন্দা।'

'কোন লাভ নেই। আমায় কাপড়-টাপড় আনতে আবার ডেরায় যেতেই হবে। সুতরাং, গুড-বাই।' ঝুনুকে আদর ক'রে তার কাছ থেকে বিদায় নেয় : 'চলি রে গোলাপের কাঁটা।'

ঝুনু মুখ তুলে বলে, 'কি বললে, মামা ?'

'গোলাপের কাঁটা।'

'হি হি, গোলাপ বাবার নাম।'

'হ্যাঁ, আর কাঁটা তোর নাম।'

'ধ্যেৎ, আমার নাম ঝুনু।'

বসন্ত চলে যায়। গোলাপ বলে, 'দাও, খেতে দাও।'

'ঝুনু আয়, একসঙ্গে বসবি।' সাগরী ডাকে।

রান্নাঘরে ওরা খেতে বসে। মধ্যে গোলাপ, দু'পাশে রুনু-ঝুনু। ভাজাটা, আলুটা, মাছটা এমনি সব টুকিটাকি জিনিস গোলাপ তুলে দেয় ওদের পাতে।

সাগর আপত্তি করে, 'ও কি হচ্ছে ?'

'ওরা খাক। আমি কত বড় বড় লোকের বাড়ীতে গিয়ে থাকি, ভালো-মন্দ কত খাই, ওরা তো আর—' একটুখানি মাছ বেছে নিয়ে ঝুনুর পাতে তুলে দেয় গোলাপ।

'আঃ, কি যে কর ! ওদেরও তো দিচ্ছি, না কি ?'

ভবন-দাদু আসেন। একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব।

'কি গো, গোলাপরাজ, এত তাড়াতাড়ি খাওয়া যে আজ ? অ, বাইরে যাবে বুঝি ? এই তোমার এক চাকরি বাবা, রাণীমা ইদিকে একা-একা—।... তার পরে—রুনু-ঝুনু, কি খবর ? রুনু-ঝুনু রুনু-ঝুনু নূপুর বাজে। রুনু-ঝুনু

রুনু-ঝুনু নূপুর বাজে।' হাত নেড়ে নেড়ে নূপুর-পরা পায়ের গতিচ্ছন্দ বোঝাতে লাগলেন।

খুশী হ'য়ে ওঠে ঝুনু, এবং রুনুও। হাসে সাগরী, গোলাপ।

গোলাপ একটু সলজ্জভাবেই বললে, 'একটু—ইয়ে—দেখবেন-টেখবেন—'

'বাপু হে, ফি-বারে আর তোমার নতুন ক'রে বলতে হবে না। তবে তোমার চাকরি বড় বেয়াড়া—এ আমি বলবই। বছরের মধ্যে আট-দশ মাস বাইরে থাকলে সংসারের—ইয়ে হয় কি ক'রে?'

বৃদ্ধের উষ্মায় গোলাপ হেসে বলে, 'ঐ কথা ভেবেই তো যাত্রাদলের বুদ্ধিমান লোকেরা বিয়ে করে না।'

'সে যে আরো বেয়াড়া হ'ল, ভাই—তারও ফল ভালো নয়।'

রুনু বলে, 'দাদু, গল্প বলবে খাওয়ার পরে?'

'না গো রাজকন্যে, আজ নয়। আমায় এখন একটু বেরুতে হবে। চৌদ্দ-নম্বরের একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটির হাত ভেঙে গিয়েছে—দেখে আসি কেমন আছে।' ভবন-দাদু ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যান।

খাওয়ার পরে শোবার ঘরে এসে রুনু বলে, 'বাবা, তুমি একটা গল্প বল।'

'আমি! আমার কি আর গল্প মনে আছে রে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আচ্ছা, চটপট ঘুমিয়ে পড়তে হবে কিন্তু—আমায় আবার বেরুতে হবে তো।'

'হুঁ, ঘুমোব। বল।'

নিজের ভাগটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় বোধহয় ঝুনু নিজের দাবী পেশ করে: 'আমিও শুনব, বাবা।'

'শুনবেই তো। শুয়ে পড়।'

'তোমার কোলে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, এইখানে মাথাটা রাখ।'

গোলাপের মনে পড়ে, এইভাবে খোকনের মাথাটা নিজের কোলের ওপর রেখে অনেকদিন অনেক গল্প বলেছে সে—গল্পের সঞ্চয় তার অফুরন্ত যাত্রা-কাহিনীর কল্যাণে; তা ছাড়া গল্পের প্রতিটি মানুষকে বাচনিক ও কায়িক অনুকৃতিতে সে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। বিভিন্ন সংলাপ সে মুখস্থ বলতে পারে। দরকার মতো গানও গাইতে পারে সে; ছোটবেলায় গান-গাওয়ার পার্ট-ও থাকত তার, এখন অবশ্য যাত্রায় তাকে বিশেষ গাইতে হয় না।

খোকনও অনেক গান মুখে-মুখে শিখে নিয়েছিল— সুর-জ্ঞান ছিল ছেলেটার।

'রাজার গল্প, বাবা।' বলে ঝুনু।

গোলাপ বলতে আরম্ভ করে, 'এক দেশে এক ছিলেন রাজা—মস্ত বড় রাজা। তাঁর লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া, মন্ত্রী-সেনাপতি সব গমগম করছে। সেই রাজার দুই রাণী—দুয়োরাণী আর সুয়োরাণী। দুয়োরাণীই বড়, কিন্তু রাজা তাঁকে তেমন ভালো চোখে দেখেন না; দুয়োরাণীর ঘর অনেক দূরে বাগানের একপাশে একটি কুঁড়ে—সেখানে ছেলেকে নিয়ে দুয়োরাণী ঘুঁটে বেচে কোনরকমে দিন কাটান। আর সুয়োরাণী রাজার কাছে থাকেন রাজ-বাড়ীতে···'

ঘুমিয়ে পড়ে ওরা গল্প শেষ হবার আগেই। রাজা আর তাঁর দুই রাণীর গল্প থাকে অসমাপ্ত।

রান্নাঘর থেকে সাগরী আসে। গোলাপ তখন ঝুনুর মাথাটা কোলে ক'রে চুপচাপ বসে আছে।

'কি ব্যাপার? বসে যে?'

'ওদের গল্প বলছিলাম।'

সাগরী হেসে বলে, 'কিসের গল্প? রাজা রাণী কী সব শুনছিলাম যেন বাইরে থেকে।' ঝুনুকে তুলে ভালো ক'রে শুইয়ে দেয়।

গোলাপও হেসেই জবাব দেয়, 'হাজার হোক, একটা রাজা তো বটি—রাজা রাজড়ার গল্প ছাড়া মুখে অন্য কিছু আসেই না; ওদের অবশ্যি অতটা এখনও সহ্য হয় না। গল্পটা শেষ করবার আগেই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সাগরী বলে, 'বল, শেষটা না হয় আমিই শুনি। দেখি সহ্য হয় কিনা।'

চাপা হাসির দুষ্টু আভায় সাগরীর মুখটা ছেলেমানুষ লাগছে—যেন রুনু-ঝুনুরই সগোত্র!

. সাগরী বলে, 'কি গো, বল, শুনি।'

'শেষ কি ছাই আমিই জানি।'

'ওমা, তাহলে সুরু করেছিলে কোন্ ভরসায়?'

'ভরসা কোথায়, বরং ভয়ই ছিল।' উভয়পক্ষেরই মুখে চাপা হাসি।

'তাহ'লে ভয়ে ভয়ে সুরু করেছিলে? ভূত-দেখার মতো আঁতকে উঠে-উঠে গল্প বলছিলে বুঝি।'

'প্রায় তাই। তারপরে অবশ্য কাটিয়ে উঠলাম।'

'কি ক'রে?'

সাগরীর হাতটা চেপে ধ'রে গোলাপ বলে, 'তোমায় পেয়ে—।'

'পাজি। এইখানেই তুমি আসতে চাইছিলে।' চোখে একটা তীব্র ক্রোধের ভাণ তীক্ষ্ণ হ'য়ে জেগে ওঠে সারা মুখের হালকা-রোদ হাসির পটভূমিতে। দুটোর বৈপরীত্যে বিচিত্র সাগরীর মুখ।

'সাগর।' গোলাপের স্বরটা একটু গম্ভীর!

সাগরী মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কি গো?'

'জানো, আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল আজ ওদের গল্প বলার সময়।'

'কেন?'

'সেই দুয়োরাণীর ছেলের কথা বলতে বলতে বারবার আমার খোকনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।'

মায়ের বুকে হঠাৎ একটা দোলা লাগে, কিন্তু সেটাকে গোপন ক'রে গোলাপের বেদনা মোছবার জন্যে একটা মৃদু পরিহাস-তরল অভিমানের সুরে বলে, 'আমি কি তোমার দুয়োরাণী নাকি গো?'

গোলাপ সাগরীকে তার কাছে টেনে নিয়ে আসে: 'না গো, না, তুমি আমার সুয়োরাণী। কিন্তু—' আকস্মিক ভাবেই থেমে যায় গোলাপ।

'কি হ'ল? কিন্তু কি?'

'কিছু নয়, সাগর।'

'সত্যি?'

'মাইরি।' ব'লেই অপ্রস্তুত হয় গোলাপ।

'ফের! বারণ করেছি না তোমায়।'

'ঠিক আছে, আর হবে না।'

সাগরীর বরদাস্ত হয় না 'মাইরি' কথাটা। বিশেষ ক'রে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় কেউ ওটা উচ্চারণ করলে অতি-কুৎসিত মনে হয় সাগরীর।

'কিন্তু সত্যি তুমি কী একটা ভাবছিলে। আমায় তুমি লুকোতে চেষ্টা করছ।'

সাগরীর মুখটা দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরে গোলাপ অস্থিরভাবে বলে, 'না না, অমন ক'রে বোলো না। তোমায় লুকোলে আমার চলবে কি ক'রে?'

খোকনের প্রসঙ্গ উঠে পড়ার পর থেকেই সাগরীর বুকের মধ্যে একটা বেদনার দোলা লেগেছিল—এখন গোলাপের অস্থিরতা সেটাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। 'ওগো, আমি অমন ক'রে আর বলব না। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি তুমি বড় কষ্ট পাচ্ছ।'

'হুঁ, পাচ্ছি। সে যে আমার ওপর রাগ ক'রে চলে গেছে, আমি ভুলতে পারি না, সাগর।'

'ওগো, ও-কথা বোলো না। ও-কথা ভেবে নিজেকে দোষী ক'রে তুলো না। নিজেকে দোষী ভাবলেই তোমার কষ্ট বাড়বে।'

'কিন্তু আমি দোষী যে। তাকে আদর-যত্ন করিনি তো ঠিকমতো। অসুখের সময় তার কাছে পর্যন্ত থাকলাম না।'

'সে তো ইচ্ছে ক'রে নয়।'

'হুঁ, কিন্তু অসুখের সময় তার কাছে রইলাম না ব'লেই সে যাবার সময় আমায় শেষ দেখাটুকুও দিয়ে গেল না।'

সাগরীর নিজের চোখেই জল এসে গিয়েছিল, ভেবে পেল না কি ক'রে সে ঐ পিতৃ-হৃদয়ের জ্বালাটুকু নিঃশেষ ক'রে মুছে দেবে। গোলাপের কোলের মধ্যে মাথাটা গুঁজে ও নিজের আবেগটা সংযত রাখবার চেষ্টা করে। 'ওগো, ভুলে যাও, ভুলে যাও ও-কথা।' নিভৃত কণ্ঠ যেন আরো নিভৃত হয়, স্বগতোক্তির সুরে বলে, 'ওগো, আবার সে আসবে, আবার আসবে।'

গোলাপ সাগরীর মাথার ওপর দিয়ে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবছিল এর সম্ভাব্যতার কথা। সত্যি, এ তো হ'তেই পারে। ডাক্তার তো নিশ্চিত করে কিছু বলেনি। তাদের যা বয়েস, এ তো যে-কোনদিনই ঘটতে পারে। কিন্তু তেমন দিন যদি সত্যিই আসে, খোকনই কি আসবে ফিরে? অন্য কেউ নয়? কে জানে! তবু এই মুহূর্তে ভাবতে ভালো লাগল, খোকন আবার তার ফিরে-জীবন সুরু করেছে এই ঘরে, এই বাপ-মার কোলে। সাগরীর প্রসব-যন্ত্রণা আর গোলাপের উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এসে খোকন পৃথিবীর মাটিকে আঁকড়ে ধরল—কাঁদছে খোকন। কাঁদিসনে রে, কাঁদিসনে, এই তো আমি, আয় কোলে আয়। কতদিন যে কোলে করি না তোকে। বড় হচ্ছে খোকন, কেঁপে-কেঁপে হাঁটে, খিলখিল করে হাসে, সাগরী বলে—পা পা, সোনা পা; চলার তালে তালে মাথায় সোনার টিকলীটা দোলে। দুরন্ত হয়ে উঠছে—ভাঙছে-চুরছে আর হাসছে। গোলাপকে বাইরে যেতে দেবে না—ঘুমোবার সময়ও গোলাপের কোঁচার খুঁটটি হাতের মুঠোয়। খোকনের মুখটা সুন্দর, কচি, মেয়েলি—একেবারে সাগরীর আদল। মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়—বাংলাদেশের লোকেদের বিশ্বাস। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে গোলাপের মনেও বিশ্বাসটা আছে। কিন্তু ছেলেকে সে সুখ দিতে পারল কই।

খোকনের ঐ মুখে সাগরকে সে অনেকবার দেখেছে—সে তার ছেলেও

বটে, সাগরের নতুন একটা ক্ষুদে সংস্করণও বটে ; অদ্ভুত একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত সে ছেলের প্রতি। নতুন যে আসবে, সে যদি খোকন হয়; তবে সাগরের মুখ নিয়েই আসবে। যতবার সে চোখ বুজল, ঐ অমন মুখই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু নতুন-খোকন যে এল, কত লাফালাফি দাপাদাপি করল, কই সে তো আর বড় হচ্ছে না ; খোকন যত বড় হয়েছিল সেই অবধি এসে সে যেন থেমে গেল. গোলাপের কল্পনা আর এগোতে পারে না ; তারপর, তারপর—একটা অন্ধকারের মধ্যে গোলাপের হাহাকার হাতড়ে বেড়াতে থাকে।

সাগরীর মাথার ওপরে অস্থিরভাবে হাত বোলাতে লাগল গোলাপ। সুন্দর চুল। এখন একটু পাতলা হয়েছে, বিয়ের সময় অজস্র ছিল। আজ একটা মালা পরেছে খোঁপায়। অনেকক্ষণ ধরেই গন্ধটা ছুঁয়ে যাচ্ছিল গোলাপকে হালকাভাবে, কিন্তু এতক্ষণ মালাটার দিকে নজর পড়েনি।

'তোমার চুলে মালা এলো কোথা থেকে ?'

লজ্জা পেয়ে যায় সাগরী। আট বছরের বিবাহিত জীবনেও তার লজ্জা যায়নি। বলে, 'ঐ পরিয়ে দিলে ছোটবৌ। কত মানা করলুম, শুনলে না।'

ছোটবৌ অর্থাৎ ভবন-দাদুর ছোট ছেলের বৌ।

'কেন, মানা কেন ? বেশ সুন্দর হয়েছে তো।'

'সুন্দর না ছাই। তিন ছেলেমেয়ের মা, বুড়ো বয়স, এখন আবার মালা। ও ছোটবৌকে মানায়।'

'বুড়ো কোথায় ! আমি তো তোমাকে বেশ—' ঠিক কথাটি খুঁজে পায় না গোলাপ। 'সেই লালগোলায় তোমাদের বাড়ীতে প্রথম যেদিন তোমায় দেখেছিলুম, তেমনি।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা। তোমরা তো এবার মুর্শিদাবাদ যাচ্ছ—পারলে লালগোলায় বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে এসো—বুড়ো মানুষ !'

'হুঁ, করব—যদি পারি।'

একটু পরে সাগরী বলে, 'রুনু-টা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।'

দুজনেই তাকায় ঘুমন্ত রুনুর দিকে। পুরো প্রশান্তিটা নেই বোধহয় ওর মুখে, যা ওর বয়সের বাচ্চাদের থাকা উচিত। বয়সের তুলনায় একটু গম্ভীরও।

গোলাপ বলে, 'খোকন চলে যাওয়ার পর থেকেই অমনটা হয়েছে—একেবারে পিঠোপিঠি তো।'

'তা ঠিক। তবে তোমাকে ও আরো বেশী করে চায়। আগেও তোমার খুব ন্যাওটা ছিল, খোকন চলে যাওয়ার পর থেকে আরো বেশী হয়েছে।'

হঠাৎ নিজের মাথাটায় একটা জোর ঝাঁকি দিয়ে বলে গোলাপ, 'দেব এ-শালার চাকরি ছেড়ে!'

সাগরী জানে, এ কাজ গোলাপের ছাড়া সম্ভব নয়। নতুন কর্মক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করবার অসুবিধাটা বড় কথা নয়। আসলে এ কাজটা গোলাপ ভালবাসে, এর একটা নেশা বাসা বেঁধে আছে গোলাপের মজ্জায়, সেটাকে উপড়ে ফেলা অসম্ভব।

দূরকে তার ভালো লাগে, তার মধ্যে একটা যাযাবর প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে আছে। অথচ মানুষটা স্নেহে-প্রেমে কোমল, একটু হৃদয়ের ছোঁয়া পেলে বিগলিত হয়ে যায়। ঘরকেও সে ভালবাসে—ঘর তার প্রাণ। তাই ঘর-বাইরের দুটো উল্‌টোমুখো টান কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে দুষ্কর। সাগরী লক্ষ্য করেছে, তাই গোলাপ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক, বুঝি বা বিষণ্ণ, কখনো অস্থির, হয়তো একটু অসহায়ও। দ্বিমুখী স্রোতের মাঝে দুঃসহ কোন ভবিষ্যৎকে কল্পনা ক'রে কখনও ঈষৎ ভীত। সাগরীর মমতা হয়, দুঃখ হয়; ইচ্ছে হয়, মুছে নেয় গোলাপের সব জ্বালা। কিন্তু সবটুকু পারে না সাগরী। চেষ্টা করে, তবু গোলাপ যেন পুরো শান্ত হয় না, আর নিজের অক্ষমতায় সাগরীর চোখে জল নামে।

গোলাপ আশ্চর্য হ'ত: 'সাগর, তোমার চোখে জল!'

সাগরী বলতে চাইত: 'না-কেঁদে যে পারি না, রাজা।' কিন্তু মুখে তার কথা বেরুত না, মাথাটা নামিয়ে আনত গোলাপের বুকে।

সাগরী প্রথমে দু'নৌকার বিপরীতমুখী গতির থেকে একটা নৌকায় তুলে আনতে চেয়েছিল গোপালকে। ভেবেছিল এইটেই মুক্তির পথ। ঘরের জীবনেই সে পুরো আসুক। কিন্তু গোলাপ কোন নৌকা থেকেই পা তুলতে পারল না।

গোলাপের অন্তরের মধ্যে একটা শিল্পী মন আছে। মানুষের দৈনিক প্রীতির স্বাদ না পেলে সে মনমরা হ'য়ে পড়ে থাকে—দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টির অভিনন্দন ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। অভিনয় ভালবাসে সে, কিন্তু অভিনয় তো ঘরে বসে হয় না, দর্শক চাই। হ্যাজাকের বাতি জ্বলছে অনেকগুলো, মধ্যিখানে আসর, চারদিকে লোক গিজগিজ করছে, যাত্রাদলের সেই বিচিত্র

কনসার্ট বাজছে—প্রবেশ করল রাজা, শান্ত হ'য়ে এল কোলাহল, নীরব হ'ল ঐকতান-বাদন ;—এই আবহাওয়ার মধ্যে না দাঁড়াতে পারলে গোলাপের নিশ্বাস নিয়ে সুখ নেই।

ক্রমে সাগরী বুঝেছে এসব। তখন আর তাকে তার যাযাবর শিল্পবৃত্তি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেনি। এই বৃত্তির সব অস্বাচ্ছন্দ্য সে মেনে নিয়েছে।

একটা অস্বাচ্ছন্দ্য, একটা বিষণ্নতা মাঝে মাঝে গোলাপকে পেয়ে বসে। সাগরীকে সে সুখী করতে পারেনি, এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা কেন যে তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, তা সাগরী ঠাওর করতে পারে না। এ বৃত্তি ঘরকে অবহেলা করায় বলেই হয়তো গোলাপের এ অপরাধবোধ।

আট বছরের দাম্পত্য-জীবনেও গোলাপকে সে নিঃশেষ করে বুঝতে পারেনি। অনেকখানি চেনে তাকে, কিন্তু পুরো নয়। এই অপরিচয় সূক্ষ্মভাবে আজো তাদের মধ্যে বেঁচে আছে—যেমন থাকে নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে। তাই আটবছরেও সাগরীর আগ্রহ-আকর্ষণ একটুও কমেনি —নতুন প্রেমের স্বাদ মরেনি, পুরোনো হয়নি ; বরং আটবছরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে, একটা স্নিগ্ধ মমতা ঘিরে আছে এই প্রেমকে। কিন্তু তবু দুজনের মধ্যে হালকা কুয়াসার মতো একটা পর্দা আছে। আছে, সন্দেহ নেই তাতে। আশ্চর্য লাগে মাঝে মাঝে সাগরীর। অনেক সময় সে ভালো করে দেখতে চেয়েছে ঐ যবনিকাটা। কিন্তু হালকা কুয়াসা ধরা যায় না। শুধু এক সূক্ষ্ম শীত-শিহরণ অনুভব করেছে। সাগরীর স্নিগ্ধ মমতা অনেক সময় স্পর্শ করতে পেরেছে যবনিকা-পারের একটা যন্ত্রণাকে, কিন্তু যন্ত্রণার কারণ জানতে পারেনি।

খোকনের মৃত্যু এর কারণ নয় ; তার আগে থেকেই, এমনকি খোকনের জন্মেরও আগে থেকে সাগরী এর অস্তিত্ব অনুভব করেছে।

খোকনের কথা আজ বেশী করে মনে পড়ছিল গোলাপের। অমন ওর মাঝে মাঝে হয় ; সাগরী লক্ষ্য করে দেখেছে, বাইরে যাবার মুখে খোকনের স্মৃতির ছায়া ওকে আরো বেশী করে ঘিরে ধরে। ও যে নিজেকে খানিকটা অপরাধী করে বসে আছে খোকনের মৃত্যুর জন্যে—তার শেষসময়ে যে গোলাপ থাকতে পারেনি ওর পাশে, তার অনুনয়কে অমান্য করে গিয়েছিল বাইরে গাওনা করতে।

মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে বসে শেষমুহূর্তগুলির উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা একা সাগরী গ্রহণ করেছে, আজো সে স্মৃতি সঞ্চিত আছে তার বুকে।

'কি গো সাগর-রাণী !'

ছোটবৌ, অর্থাৎ ভবন-দাদুর ছোট ছেলের বৌ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। সে ডাকে সাগর-রাণী বলে। শুনেছিল, গোলাপের মুখে সাগরীর দীর্ঘ-ঈ লোপ পেয়ে যায় ; আর সে রাজার বৌ তো বটেই ; দুটোয় মিলিয়ে নিয়েছিল ছোটবৌ।

সাগরী দাঁড়িয়ে ছিল একটা জানলার ধারে। জানলার সামনে একফালি ফাঁকা জমি—এই ফাঁকাটুকুর প্রসাদে জানলার ধারে ঘাড় কাৎ করে দাঁড়ালে একটুকরো আকাশ দেখা যায় ; উদ্ধত-প্রাসাদ নগরের একতলার পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। সেই সৌভাগ্যের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল সাগরী।

'কি, কথা বলছ না যে ?'

নিঃশব্দে হাসে সাগর। নিজের খোঁপার মালার ফিকে গন্ধ ছোটবৌর মালার সঙ্গে মিশে জোরালো হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে অনেকখানি বাতাস টেনে নেয় বুকের মধ্যে : 'কি বলব ?'

'ওমা, সব কথা বুঝি চন্দ্ররাজ শুষে নিয়ে গেছে ?'

ছোটবৌ গোলাপকে বলে চন্দ্র। প্রথম দিন সাগরী নামটার মানে বুঝতে পারেনি। ছোটবৌ বুঝিয়ে দিয়েছিল—চাঁদের আকর্ষণেই তো সাগরের বুক উদ্বেল হয়ে ওঠে।

'চন্দ্র তো শুষতে পারে না।'

'বাঃ, এই বেশ কথা ফুটেছে বাঙাল মেয়ের।'

'এমন শহুরে মেয়ের সঙ্গে আছি।'

'আচ্ছা, মালা দেখে কি বলল চন্দ্ররাজ ? তুমি তো পরতেই চাইছিলে না।'

সাগরী হেসে বলে, 'না-পরাই উচিত ছিল।'

'কেন ? কি বলল।'

'বলল—তিন ছেলেমেয়ের মা, বুড়ী হয়েও সখ মিটল না !'

'কক্ষনো না, তুমি মিথ্যে বলছ।'

'বেশ, তাহলে সত্যিটা তুমিই বল।'

'বলব ? বেশ, বলছি। এমনি ক'রে তোমার মাথাটা বুকের কাছে টেনে আনল।' ছোটবৌ অভিনয়টা সম্পূর্ণই করতে থাকে। 'কিছুক্ষণ অবশ হ'য়ে চোখ বুজে শুধু নিশ্বাস নিয়ে তারপর এমনি ক'রে তোমার

চিবুকটা তুলে ধরে বলল—সাগর-বৌ, তুমি মালা পরেছ, বড় ভালো লাগছে, আমার প্রতিটি নিশ্বাস মধুর হ'ল।'

'যাক, তোমার ঘরে কী হ'য়েছে সেটুকু অন্তত শোনা গেল।'

'কি সর্বনাশ, তুমি এমনি ক'রে পরের ঘরের দরজায় কান পেতে থাক বুঝি?'

'তাদের গলার চোটেই কান পাতা দায়।'

'ভুল শুনেছ, আমার ঘরে অমন কাব্যি-করা শিল্পী লোক নেই। আমার ঘরের ভদ্রলোকটি এলেন, বিষম নাক কুঁচকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, উঃ, কিসের গন্ধ! নাক কোঁচকানোর বহর দেখে মনে হয়, বুঝি বা আশেপাশে ইঁদুর পচেছে। ঘরের এদিকে-ওদিকে তাকাতে থাকেন, চোখ দেখে বোঝা যায়, ইঁদুরটাকে খুঁজছেন। শেষটায় খুঁজে পেলেন, বাজখাঁই গলায় বললেন, অ তুমি! ভয়ে মুখ-চোখ শুকিয়ে গেল। দোষ তো একটা ক'রে ফেলেছি, এখন কি করি! ভাবছি, ক্ষমা চেয়ে ফেলি, এমন সময় ভদ্রলোক ঐরকম গলায়—শুনেছ তো কিরকম গলা—ডাকলেন, এদিকে এস। মারধোর খেতে হবে বেশ বুঝছি, ভয়ে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এসে এক ধাক্কা মেরে আমায় পেছন ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন—এই এমনি ক'রে।' ছোটবৌ সাগরীকে ধাক্কা দিয়ে ঘুরিয়ে দেয়, তার মাথার পেছনদিকটা আসে ছোটবৌর নাকের ডগায়। 'তারপরে এমনি ক'রে আমার মুণ্ডুটা ধরলেন ভদ্রলোক, বুঝলাম ছিঁড়ে নেবার চেষ্টায় আছেন। হঠাৎ শুনি ঘঘর-ঘঁ শব্দ। মাথা ঘুরিয়ে দেখতেও পারি না ব্যাপার কী, মাথাটা যে তাঁর দুটো ভালুক-থাবার মধ্যিখানে, ঘাড় নাড়বার জো কি! শব্দটা এদিকে চলছেই, চলছেই; আমি এদিকে ভয়ে মরছি তো মরছিই। ভদ্রলোক দম ছাড়লেন—আঁঃ! বুঝলাম, ঘঘর-ঘঁ হচ্ছে নিশ্বাস, অর্থাৎ উনি মালার গন্ধটা শুঁকলেন। তারপর হাতীর ডাকের মতো গলায় বললেন, আঁঃ! আমি চমকে উঠলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারের মতো প্রাণটা যখন বেঁচেছে, আর ফুল নয়, বরং ফল। পুরুষ জাতটার নাক-চোখ কিছুই নেই, ভগবান ওদের শুধু একটা নোলা দিয়েছেন। ঐ খোঁপায় যদি একটা ফজলি আম ঝুলিয়ে যেতাম, আদর হ'ত বেশী, একেবারে হুপ-হাপ ক'রে আদর করত।'

ছোটবৌর ভঙ্গিতে না হেসে উপায় ছিল না। কিন্তু ভেতরে ক্লান্তি অনুভব করছিল সাগরী। এই মুহূর্তে সে নিজেকে একান্তে চাইছিল। গোলাপের

নিবিড় সান্নিধ্য নির্বাসিত হ'য়ে যাবার পর আবছা ব্যথার ছায়ায় ঘেরা এই নিঃসঙ্গতাকে ছুঁতে চাইছিল সে।

ছোটবৌ তখন স্বরু করেছে, 'জানো, সেদিন ও বলছিল—'

ছোটবৌর সব কথাই প্রায় আরম্ভ হয় 'ও বলছিল' দিয়ে—ওটা ওর কথার ধুয়ো, বারবার ঘুরে আসে, জিভের সঙ্গে সেঁটে আছে। কিন্তু তার প্রাণ-প্রাচুর্য ও বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্য ততটা একঘেয়ে লাগে না।

আজ অবশ্য বেশীদূর এগোতে পারে না ছোটবৌ। সাগরীকে রেহাই দেবার জন্যই যেন একটা পায়ের শব্দ বাইরে শোনা যায়—শব্দটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

'এই, চলি ভাই, ও এসে গেছে—' ছুটে বেরিয়ে যায় ছোটবৌ। তার মালা-ঘেরা খোঁপা নাচতে নাচতে সাগরীর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

মালা সম্পর্কে ছোটবৌর গল্পটি সম্পূর্ণ বানানো, এখন বোঝা যায়, কারণ 'ও' এতক্ষণ বাড়ীই ছিল না, এই বাড়ী ফিরল। তবু হাসি পায় সাগরীর—বেশ মজা ক'রে বলেছে যাহোক।

গোলাপ বাইরে গেলে ছোটবৌ তার একমাত্র সাথী হ'য়ে দাঁড়ায়। না, একমাত্র নয়। আছে বাচ্চারা, আছে ঘর-সংসার। তা ছাড়াও আর একটি জিনিস—বিভিন্ন সময় নানা জায়গা থেকে লেখা গোলাপের চিঠি। এ চিঠিগুলোই তার সবচেয়ে বড় সঙ্গী। কত দেশের বাতাসে সজীব, কত সময়ের অনুভূতিতে নিবিড়-রসস্থ। কত দিনকে গেঁথে রেখেছে ঐ চিঠির মালা; ঐ চিঠির পাখাতে ভর করেই সাগরী দেখে এসেছে কত নাম-না-জানা দেশ, গোলাপের মনের কত অজ্ঞাত প্রত্যন্ত। চিঠিগুলো ঘুমিয়ে থাকে বাক্সের মধ্যে, সাগরীর সোনার-কাঠির ছোঁয়ায় সেগুলো জেগে ওঠে, তাকে শোনায় সেই পুরাতনী, যা তার কাছে চিরদিনই নতুন। পড়ে পড়ে সব চিঠি তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, তবু আজো চিঠিগুলো তাকে হাসায় কাঁদায়, নিয়ে যায় জীবন্ত অতীতে।

ধীরে ধীরে বাক্সটার কাছে এসে দাঁড়ায় সাগরী। এর মধ্যেই আছে চিঠিগুলো। বাক্সটার পাশে কতকগুলো ছেঁড়া-ছেঁড়া বই: মাইকেল, গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, হেমচন্দ্র—এঁদের বই; মলিন, দুর্বল কাগজের গ্রন্থাবলী—এখন আরো জরাগ্রস্ত। যাত্রার নাটক খানকতক—কয়েকটি ছাপার হরফে, আর কতকগুলো লাল রঙের খেরোর খাতায়—লম্বা, বড়। কয়েকটি যাত্রা-

পালা গোলাপের নিজের লেখা। রবীন্দ্রনাথের বই-ও সামান্য দু' একখানা আছে।

যাত্রাদলের বড় অভিনেতারা সময় সময় কিছু অংশ নিজেরা বানিয়ে বলে। নিজের রচনা-শক্তিকে সাহায্য করবার জন্যেই গোলাপ এই সব খ্যাত লেখকদের বই পড়ে—এইসব বইয়ের বহু অংশ তার মুখস্থ।

সাগরীও বহুবার পড়েছে বইগুলো—অনেক দাঁতভাঙা দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও পড়তে নেহাত মন্দ লাগে না তার। এখানে শুধু তার সাহিত্যের আনন্দ নয়, তার স্বামীর বহির্জীবনকে কেবলমাত্র এইখানেই সে একটু স্পর্শ করতে পারে —এটুকুর মূল্য কম নয়। গোলাপ যখন বাইরে যায়, তখনই বিশেষ ক'রে সে পড়ে এই বইগুলো। এর ওপর হাত রাখলেও গোলাপের ছোঁয়া পাওয়া যায়। একটা অদ্ভুত মমতা আছে সাগরীর বইগুলোর ওপর।

আজও হাতটা রাখে সেখানে। বইগুলো কাত হ'য়ে বাক্সটার গায়ে ঠেস দিয়ে ছিল। সেগুলো গুছিয়ে রাখে। তারপর বাক্সটা খোলে। এক পাশে চিঠিগুলো সাজানো রয়েছে—কালানুক্রমিকভাবে পর পর। আর এক পাশে দু'একটা জামা-প্যাণ্ট—খোকনের। বাক্সে তোলা ছিল এগুলো আগে থেকেই, শেষদিনে খোকনের সঙ্গে সাগরী অনেককিছুই দিয়ে দিয়েছিল—কি হবে এসব, ছেলেটাই যখন রইল না!—কিন্তু এখানকার জামা-প্যাণ্ট থেকে গিয়েছিল, এখনও রয়েছে। আর রয়েছে দুটো লাট্টু, গোটাপাঁচেক গুলি—খোকনের সঞ্চয়। এক কোণে একটা কৌটো—এটা অবশ্য সাগরীর।

এক কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে তার হাতটা আজ কৌটোটার দিকে এগিয়ে আসে। খুলে ফেলে ঢাকনিটা। ভেতরে সাগরীর টুকিটাকি দু'-এক টুকরো গয়না; আর একটা টিকলী—খোকনের অন্নপ্রাশনে গোলাপ দিয়েছিল, আর্থিক দিক দিয়ে কষ্ট স্বীকার করেই দিয়েছিল, এবং প্রচুর অনটনের মধ্যেও এটাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। আর রয়েছে খোকনের একটা ছোট-সাইজের ফটো। সাগরী অনেকবার ভেবেছে, ফটো-টা বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক'রে উঠতে পারেনি তা—খোকনের স্মৃতি সবসময় গোলাপের চোখের সামনে জাগিয়ে রাখলে তার কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। তাই ফটো-টা আছে এখানে। হাফ-প্যাণ্ট আর একটা গেঞ্জি পরনে; হাসিটা মুখ থেকে ছড়িয়ে যেন সারা দেহে হালকা পাখায় উড়ছে; চুলগুলো কোঁকড়া—সাগরীর মতো। এই ঘরেই সে থাকত, ঐ যেখানে আজ ঝনু-ঝুনু শুয়ে ঘুমোচ্ছে, ওখানেই মার কোলের কাছে, স্নিগ্ধ

কমনীয় কত রাত সে কাটিয়ে গিয়েছে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে জানলার ওধারে একফালি জমি—ওখানে সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত, ওখানকার প্রতিটি ধূলিকণায়, প্রতিটি ঘাসের ডগায় তার পায়ের ছাপ রয়েছে আজো।

থাক্ ফটো, থাক্ চিঠি। বাক্সটা বন্ধ ক'রে দেয় সাগরী। আজ আর চিঠি পড়া যাবে না, একটা শূন্যতা বুকের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে গেছে—এই সময় গোলাপকে বড় প্রয়োজন, সে কাছে থাকলেই সান্ত্বনা, তার স্পর্শ ই শান্তি।

'আবার সে আসবে'—নিজের কথাটাই নিজের কানের কাছে আবার বাজল। ঝুনুর পরে যে-সময় গেছে, শারীর-তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে এতদিনে তার কোলে আর একটি আসতে পারত। কিন্তু আসেনি। খোকন কি তবে সত্যি রাগ করেছে, অভিমান করেছে? সেই অভিমানেই আসেনি? ওরে খোকন, ভুলে যা তোর রাগ, ফিরে আয়, আমার কান্না কি তুই শুনতে পাস না, তোর ছায়া-শরীর কি এই ঘরে দাঁড়িয়ে আমার চোখের জল দেখেনি কোনদিন! তোর বাপের সামনে কোনদিন মার বুকফাটা কান্না কাঁদতে পারিনি, সব কষ্ট চেপে রেখেছি, নইলে সে যে বড় কষ্ট পায়। সে বাইরে গেলে তবে কাঁদবার একটু সুযোগ হয়।

চোখের জল মুছে বইগুলো আবার নাড়াচাড়া করে সাগরী।

খোঁপার মালায় তাজা একটা করুণ গন্ধ, আর বইয়ের পুরোনো পাতায় ধূসর একটা গন্ধ—দুটোয় মিশিয়ে মূক এক দীর্ঘশ্বাস।

হাতে উঠে আসে একটা নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—ওপরে কালির একটা ধ্যাবড়ানো দাগ, খোকনের কীর্তি। কুকীর্তির জন্যে বকেছিল গোলাপ। ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কেঁদেছিল খোকন।

আস্তে আস্তে পাতা ওল্‌টাতে থাকে সাগরী—কালির সুবৃহৎ মানচিত্র ক্রমে ছোট হ'তে থাকে, আর এক-এক পাতায় বইয়ের কাহিনীর এক-একটি মুহূর্ত। কালির দাগ একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছোয়—সে-পাতাটা তুলতে তুলতে গিয়েও তুলল না সাগরী, পরের পাতায় আর বিন্দুটিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, জানে সাগরী। সেই পাতাটাতেই থমকে রইল সাগরী—অক্ষরগুলোর দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে তার চোখের দৃষ্টি ফিরে এল, কাহিনীর বিশেষ মুহূর্তটি হ'ল উদ্ভাসিত। প্রায় মুখস্থই আছে জায়গাটা—অভিমন্যুকে উত্তরা বলছে:

'না, না, নাথ! উত্তরার থাকিতে জীবন,
দিবে না তোমায় যুদ্ধে করিতে গমন।'

... ...

বালিকার ক্ষুদ্র মুখ হইল গম্ভীর,
পড়িল মেঘের ছায়া যেন জ্যোৎস্নায়।
চাহি চন্দ্রপানে, রাখি পতি-বুকে শির,
রহিল নীরবে, নেত্র মুদিল নিদ্রায়।
চাহি চন্দ্রপানে অভিমন্যু কতক্ষণ
রহিলা নীরবে বসি; কতই ভাবনা
হইল উদয় মনে, জাগিল তখন
প্রতিভা সিন্ধুর বক্ষে কতই কল্পনা।
নিদ্রিতা বালিকা স্বপ্নে করিয়া চীৎকার
কহিলা—'না প্রাণনাথ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি, ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এত দূর হায়!'
কুমারের দুই চক্ষু হইল সজল।
রহিলা সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—
জ্যোৎস্না প্লাবিত যেন মুদিত কমল।
ধরি দুই করে পুষ্পনিভ দুই পাণি
চুম্বি প্রেমভরে মুখ, রাখি উপাধানে,
জানু পাতি ভূমিতলে বসি ভক্তিভরে,
চন্দ্রিকাপ্রদীপ্ত নীল আকাশের পানে
চাহিয়া, কহিলা কর-জোড়ে সকাতরে—
'নারায়ণ! এ স্বপ্ন কি তব মনস্কাম?
দিও বালিকায় শান্তি, পদাম্বুজে স্থান।'

হ্যাঁ, নারায়ণ, তুমি শান্তি দিও, শান্তি দিও সাগরীকে! বিড়বিড় ক'রে বলল সাগরী নিজের মনে।

দু'একদিন পরে একটি আসরে ধরাচুড়া প'রে গোলাপ বলছিল:

'রবিকরে, জ্যোৎস্নায় চাহি সিন্ধু শোভা,
চাহি বন-প্রকৃতির শোভা মনলোভা,

গাঁথিব কবিতা-হার ; গাঁথিবে উত্তরা
কাছে বসি ফুলমালা ; বীণা সপ্তস্বরা
বাজাইবে, বীণা-কণ্ঠে গাহিবে কখন
পুরিয়া সুধায় সেই নির্জন কানন।
সঙ্গীত-তরঙ্গে মুগ্ধ কল্পনা আমার
স্বর্গে, মর্ত্যে, অঙ্কে অঙ্কে করিবে বিহার।
বাসন্ত, শারদ, ফুল্ল জ্যোৎস্না-মণ্ডিত
নীল বন-সরোবরে, তরী মনোহরা
ভাসাইয়া, নিরখিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত
নীলাকাশ গাব আমি, গাহিবে উত্তরা।

... ...

এ সুখ স্বপন
ছিল জীবনের মম আশা অন্যতম।'

বলবার সময় সবটুকু যথাযথ মনে থাকে না, সেটুকু গোলাপ বানিয়ে নেয়, শক্ত জায়গাগুলোকে একটু নরম ক'রে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু যেসব জায়গায় ধ্বনি-গাম্ভীর্যের ডমরু শ্রুতিসুখকর, সেখানে সে বাদ দিতে চায় না।

গণেশ নামে একটি কিশোর ঠিক বাঙালী উত্তরার মতোই মানের সুরে বলল যে অভিমন্যু বোধহয় তাকে তত ভালবাসে না।

গোলাপ ধীরে এগিয়ে এসে 'উত্তরা'র হাত ধরল, কিশোরী বধূর মুখের মধ্যে যেন সাগরীরই ছায়া দেখল। এ কী কথা তোমার মুখে, প্রিয়তমা! সারাটা জীবনের এইতো সবচেয়ে বড় সত্য—তোমায় আমি ভালবাসি, বারবার বলেও যে সাধ মেটে না আমার, জীবন দিয়েও যে এ কথাটা প্রমাণ করতে চাই।

দর্শকরা স্তব্ধ হ'য়ে অভিনয় দেখছে। মেয়েদের চোখে জল এসে গেছে। বীর অভিমন্যুর কৈশোর-প্রেমের মোহাঞ্জন লাগছে বৃদ্ধদের চোখে। অভিমন্যু যে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে যাচ্ছে!

গভীর চোখে 'উত্তরার' দিকে তাকিয়ে গোলাপ বলল :

'তুমি নয়নের আভা—তুমি রসনার সুধা
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল।
তুমি মম চির-সুখ, তুমি মম চির-দুঃখ,
সুখ-দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল।'

'উত্তরা' চোখ তুলে তাকাল—তার দু'চোখে জল। 'জানি গো, জানি, তোমার ভালবাসাতেই তো বেঁচে আছি, সে তো আমার অজানা নয়। কিন্তু দুজনের এই স্বর্গ থেকে কেন তুমি চলে যেতে চাও?'

গোলাপ বলল, 'যেতে যে আমায় হবেই, উত্তরা, আমি যে সেই অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছি। আমি ক্ষত্রিয়, রণক্ষেত্রই তো আমার জীবন; অভিমন্যু আমি, আমি অর্জুনকুমার।'

'উত্তরা' বলল, 'সবই তো বুঝি, প্রিয়তম! আমিও তো ক্ষত্রিয় নারী। অর্জুনকুমারকে অন্তঃপুরের কাপুরুষতায় শৃঙ্খলিত ক'রে রাখতে পারি না। কিন্তু আমি যে স্ত্রী! আমার চোখের পাতা যে কাঁপছে, কুমার! ও কোথায় কোন্ অমঙ্গলের ছায়া দেখেছে, কে জানে। কাল রাতে যে দেখেছি দুঃস্বপ্ন, তোমার বুকের মধ্যে শুয়েও তাই কেঁদেছি একা, ঘুমিয়েছিলে তুমি, টের পাওনি।'

ক্ল্যারিওনেট ধরেছে করুণ সুর। অভিমন্যু উত্তরাকে সান্ত্বনা দিল, নিজের বীরত্ব ও যুদ্ধক্ষমতা সম্পর্কে তাকে নিঃসংশয় করল। দর্শকরা অভিমন্যু-উত্তরার শেষ দাম্পত্য-দৃশ্যের অশ্রুজল নিজেদের চোখে ধারণ করেছে। অভিমন্যু চলে যাচ্ছে—তখনো সে উত্তরার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু তাদের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে।—

'বিদায় বিদায় প্রিয়া,
শীঘ্র আসিব ফিরি
কৌরবেরে করিয়া সংহার।'

অভিমন্যু এই বিদায়-বাণী ব'লে প্রস্থান করল। উত্তরা বেদনার একটা অভিব্যক্তির পর 'নাথ' 'নাথ' আর্তরবে মূর্ছা গেল। আসরে তার পতনের খানিকটা পরে পরবর্তী দৃশ্যের সময় সেও উঠে বে-সরকারীভাবে প্রস্থান করল।

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। এমন যাত্রা এখানকার লোকে অনেকদিন শোনেনি। 'অভিমন্যু বধ' ছাড়াও আগের দু'রাত্রি হয়েছে 'বঙ্গবীর'—বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের নাট্যকথা, আর কর্ণার্জুন'—অভিশপ্ত মহাবীর ও কৃষ্ণ-সহায় গাণ্ডীবধারী দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব। ও দুটো পালাই ভালো হয়েছে, কিন্তু 'অভিমন্যু বধ'-এর মতো কোনটাই নয়, বিশেষ ক'রে অভিমন্যু-উত্তরার বিদায়-দৃশ্যের তুলনা হয় না। অভিনয়-শেষে সাজঘরের চারদিকে কৌতূহলী জনতা ভেঙে পড়ল।

বিদায়-দৃশ্যের মুখর প্রশংসায় গণেশ ছেলেটি অধিকারী দাসমশাইর কাছে কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধির দাবী করুণভাবে পেশ ক'রে ফেলল এবং নগদ-বিদায় পেল কয়েকটা মুলোদাঁতের খিঁচুনি : 'যা যা, বেরো, গাধা পিটিয়ে মানুষ তৈরী করলুম, এখন ব্যাটা এয়েচে ফুটানি করতে ! তাও যা করেচে গোলাপ করেচে, তুই তো সঙের মতো দাঁইড়ে ছিলিস্। আহা মূর্চ্ছো যাবার কি ছিরি ! ঐরকম ক'রে লোকে মূর্চ্ছো যায়, ছোঃ ছোঃ ! বলি, জীবনে কি একদিনও মূর্চ্ছো যাসনি ? না গেচিস, না গেচিস, লোকের মূর্চ্ছো কি দেখিসওনি···এই যে বাবা গোলাপ, এসো, এসো বাবা, তুমি তো আমাদের লক্ষ্মী। হ্যাঁরে গণশা, দাঁইড়ে রইলি যে, কথা বুঝি কানে যাচ্চে না ?'

গণেশ আস্তে আস্তে চলে গেল। 'উত্তরা'র বিলোল কটাক্ষে এখন আগুন ঝরছে।

গোলাপ বসল।

'বুল্লে কিনা গোলাপ-বাবাজী, গণশা এয়েচিল, মাইনে বাড়ানো না হ'লে ওঁর নাকি চলচে না। আরে বাপু, এই তো বয়েস, এই বয়সে কোথায় কাজ শিখবি, তা নয়, খালি টাকা টাকা ! আজকালকার ছেলেরা যে কি হয়েচে ! আমি যখন যাত্রাদলে ঢুকি, তখন আমার মাইনে ছিল দু'টাকা আর খোরাকি, সখীর দলে নাচতুম, আর গানেও গলা ছিল চমৎকার, না, না, এমন হেঁড়ে গলা বরাবর ছিল না। হ্যাঁ হে গোলাপ, তুমিই বল না, প্রথমে তুমি কত পেতে ?'

অতি সামান্য, কিছুই না একরকম। কিন্তু সে-আলোচনায় এখন মন ছিল না গোলাপের। বলল, 'বহরমপুরে পালা হবার কথা ছিল—কি হ'ল ?'

'হ্যাঁ, হবে। দু'পালা। আজই কথা পাকা করতে এয়েছেল।'

'কবে কবে ?'

'সে হপ্তাখানেক দেরী আচে। কিন্তু তার আগে আর একটা বায়না পেইচি ঐ বহরমপুরেই, এই মঙ্গলবারে। একটি বড়লোকের ছেলের ভাত, তাইতে।'

'সে তো এখনও তিন দিন।'

'হুঁ, খোরাকি দেবে আগের দু'দিনেরও। কালকেরটা এখানেও একটু ইয়ে করতে হবে। এখানকার কর্তাদের একটু তেল দিতে হবে। তবে কিনা, কাজ ফুরিয়ে গেলে সব ব্যাটাই তো বলে—শালা।'

'আমি তাহ'লে কাল বেরিয়ে পড়ব—একটু লালগোলা যাব।'

'কি সর্বনাশ ! এদিকে—'

'না, না, আমি ঠিক সময়ে বহরমপুরে পৌছে যাব।'

'লালগোলায় কি ?'

'শ্বশুরবাড়ী।'

'হুঁ—মধুর হাঁড়ী।'

'না দাসমশাই, মধুর হাঁড়ীটি এখন এখানে নেই, সেটি এখন কোলকাতায়।'

'তাহ'লে কি করতে যাবে হ্যা ?'

'বুড়ো শ্বশুরকে একবার দেখতে যেতে হবে—মধুর হাঁড়ীর মাথার দিব্যি দেওয়া আছে।'

'সবই তো বুল্লুম। তবে কিনা, ঠিক সময়মতো আসবে তো ?'

'সে ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'খুব ভাবতে হবে। আমাকেই ভাবতে হবে। আমি না ভাবলে কে ভাববে বল। সব তো গিলতে দড়। তুমি না এলে আমার কী অবস্থা হবে বুঝতে পারচো তো ?'

'আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

'একটু তাড়াতাড়ি করেই এসো ; তুমি না আসা ইস্তক আমার একটা ভাবনা থাকবে।'

গোলাপ একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'আমার টাকাটা দিলে বড় উপকার হ'ত।'

হিসেবপত্র ক'রে কিছু টাকা দাসমশাই দিল, কিছু বাকী রাখল ; যথারীতি বলল, 'তোমার রেট-টা বড় চড়া, একটু কমাও বুল্লে ?'

ক্ষুদে আর্টিস্টরা মাসকাবারী মাইনে পায়, গোলাপের মতো বড়রা পায় রাত হিসেবে—সে-রেট গোলাপের দিক থেকে খুব খারাপ নয়, মোটামুটি ; কিন্তু অসুবিধে হ'ল, মাসে অনেকদিন বেকার থাকতে হয়। দাসমশাই অবশ্য বেকারত্বটুকুর বিশেষ গুরুত্ব দেন না, তাঁর অভিযোগ, রেট-টা সম্পর্কে।

পরদিন কিন্তু যাওয়া হ'ল না গোলাপের। সখীর দলে কাজ করে বলাই, একেবারে বাচ্ছা, তার হঠাৎ হ'ল প্রচণ্ড জ্বর ও সুরু হ'ল প্রলাপ।

দাসমশাইর তাতে সুবিধেই হ'ল—বলাইর কথা ব'লেই এখানকার কর্তৃপক্ষকে নরম করবার চেষ্টা করল দাস। তার বাক্যগুণে ও বলাইর স্বাস্থ্য-বৈগুণ্যে সে-দিনের খোরাকি-সহ স্থিতিলাভের ব্যবস্থা হ'ল।

বলাইর অসহায় অবস্থার জন্যেই আটকে পড়ল গোলাপ। বসন্তরও

যাবার কথা ছিল গোলাপের সঙ্গে, সে প্রস্তুত হ'য়ে এসে দেখল, বলাইর মাথার কাছে গোলাপ বসে আছে; এবং সংক্ষিপ্তভাবে বসন্ত একটি মন্তব্য করল, 'লে হালুয়া!'

গোলাপ একটু হেসে বলল, 'কাল যাওয়া যাবে।'

'অগত্যা।' একটু এগিয়ে এসে বলাইকে জিজ্ঞেস করল, 'এই ছোঁড়া, কেমন আছিস রে?'

বলাই আস্তে আস্তে চোখটা খুলল একবার, বিহ্বল দৃষ্টিতে একটু তাকাল, তারপরে আবার চোখ বুজে ফেলল, চিনতে পারল কিনা বোঝা গেল না শূন্যদৃষ্টি থেকে।

'কাল তো যাবি বলছিস। দ্যাখ্ কাল ছোঁড়াটা কেমন থাকে।' খানিকটা ব'সে আরো দুটো-একটা কথা ব'লে বসন্ত উঠে পড়ল: 'গা-টা ম্যাজ-ম্যাজ করছে, যাই একটু গড়াইগে।

একবার দাসমশাই এসেও তদারক করে গেল: 'ও গোলাপ, এখন আচে কেমন ছোঁড়াটা? যতসব বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো—হাড়-হাবাতের দল।'

ক্রমে সন্ধ্যা এলো নেমে। টিমটিমে একটা হ্যারিকেনের পাশে গোলাপ একা ব'সে রইল। বলাইর আরক্ত অস্থির মুখটার দিকে তাকিয়ে খোকনের কথা মনে পড়ছিল তার। এইরকম একটা আরক্ত অস্থির মুখকে বাড়ীতে রেখেই সেবার বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল গোলাপকে—মেদিনীপুরে কয়েকটা জায়গায় তাদের দলের গাওনা ছিল।

তার অনুপস্থিতিতে ভবন-দাদু চিকিৎসার ত্রুটি করেননি। কিন্তু ভবন-দাদুর ভাষায় 'ভগবান ওকে ডেকেছিলেন', আর গোলাপের চিন্তায় 'আমার অবহেলাতেই ও অভিমান করে চলে গেল, ও যে আমায় বড্ডো ভালবাসত'।

খোকনের শেষসময়ে গোলাপকে তার করা হ'য়েছিল, সে-তার পায়নি গোলাপ, সে তখন অন্যত্র কর্ণের বেশে বৃষকেতুর জীবন সমর্পণ করছিল; সেদিনের অভিনয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিল তার সারা দেহ-মন।

চিঠি লিখল, 'জানাও, খোকন কেমন আছে।'

নিদারুণ সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এল, কিন্তু গোলাপকে খুঁজে পেল না। যাযাবর দলের সঙ্গে সে তখন নতুন জায়গায় রাবণের বেশে মৃত মেঘনাদের জন্যে বিলাপ করছিল। মাইকেলের বই তার প্রায় মুখস্থ ছিল, অভিনয় তাই মন্দ হয়নি।

মৃত্যুর তিন দিন পরে সে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন খোকনের ভস্মাবশেষ-টুকুও নেই।

বাড়ীতে ঢোকার মুখেই ভবন-দাদুর সঙ্গে দেখা। গোলাপকে কোনরকম প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই ভবন-দাদু তার হাত চেপে ধরলেন। কিছু একটা বলতে চাইলেন—অস্ফুট উচ্চারণও করলেন, কিন্তু গোলাপ স্পষ্ট কিছু শুনতে পেল না। ভবন-দাদুর কথার শব্দটা স্পষ্ট না শুনলেও অর্থটা তার অস্পষ্ট রইল না—সারা মুখের চেহারায় দুঃখসংবাদের অভিব্যক্তি ছিল। গোলাপের স্নায়ুরাজ্যে আকস্মিক একটা আর্ত ঝংকার ঝনঝনিয়ে উঠল। ভবন-দাদুর হাতটা জোরে চেপে ধরে অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'ভবন-দাদু ?'

'ভেতরে যাও, রাজাভাই !' ভবন-দাদু কান্না চেপে বেরিয়ে গেলেন।

গোলাপ ছুটে এসে দাঁড়াল তার ঘরের মধ্যে। ঘরে কেউ নেই—খোকনের রোগশয্যার চিহ্নমাত্র নেই। সাগরী নিশ্চয়ই রান্নাঘরে—ইচ্ছে করেই সে এ-ঘরে আসেনি। নইলে, সে জানে না এমন নয়; গোলাপের পায়ের শব্দ তার অনেকদিনের চেনা; তা ছাড়া, সে যে চিঠিতে জানিয়েছিল সাগরীকে, আজ এই সময় সে আসবে। সাগরী পড়েছে সে-চিঠি, শুনেছে গোলাপের পায়ের শব্দ, জানে এখন এই ঘরটাতে বিহ্বল ও বেদনার্ত গোলাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সাগরী আসছে না, হয়তো সে তার কান্নাকে চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

হঠাৎ গোলাপের সারা দেহ অসাড় হ'য়ে আসতে লাগল, ভয় করতে লাগল তার—এই মুহূর্তে যদি সাগরী সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে ? মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না সে।

শূন্য ঘরটাতে খোকনের অসংখ্য অতীত কার্যাবলী এই মুহূর্তে যেন আবার অদৃশ্যভাবে ঘটতে সুরু করেছে গোলাপের চোখের সামনে—স্মৃতির ছায়া-জগতে মিছিল চলেছে এই ঘরটিকে কেন্দ্র ক'রে।

কিন্তু এখনি হয়তো এসে পড়বে সাগরী—হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অভিযোগের শাণিত দৃষ্টি তুলে সে যদি প্রশ্ন করে—'এতদিন কি করছিলে ?'—কোন জবাব নেই গোলাপের।

এই প্রশ্ন যেন ক্ষীণ শব্দ থেকে তার মনের মধ্যে গর্জনে পরিণত হ'ল—তার অপরাধ-বোধ থেকে একটা ভীতির সৃষ্টি হ'য়ে ক্রমে যেন তার শ্বাসরোধের চেষ্টা করতে লাগল। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো সে।

ছুটি দিন সে বাড়ী ফিরল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাটাল পথে পথে। যাত্রাদলের সঙ্গে বাইরে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তখন বাইরে যাচ্ছিল না কোন দল। দুটো দিন অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটল।

তারপর আর পারল না গোলাপ। ছুটে এসে সাগরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বোবা প্রাণীর মতো মুখটা রগড়াতে লাগল সাগরীর বুকের মধ্যে, কোলের মধ্যে। কোন কথা দিয়ে নয়, শুধু তাকে দেখে, তাকে ছুঁয়ে, তার চোখের জলের স্পর্শ অনুভব ক'রে গোলাপ বুঝল তার যন্ত্রণার অতলতা—প্রতিটি মুহূর্তের সেই বিষকে সে একা পান করেছে। তবু তার কোন অভিযোগ ছিল না, সে গোলাপকে বুঝেছিল। তার ভয় ছিল—'খোকন কোথায়?'—গোলাপের এই প্রশ্নের সে কী জবাব দেবে! 'সাগর' ব'লে ডেকে যখন গোলাপ সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন তার সেই গচ্ছিত সম্পদ খোয়া যাবার কী কৈফিয়ত দেবে সে।

সেদিন চোখের জলের মধ্যে তারা উভয়ের বেদনাকে উভয়ে গ্রহণ করল।

কিন্তু যে অসুস্থ খোকনকে গোলাপ শেষ দেখেছিল, তার ছায়ামূর্তি তার চোখে লেগে রইল, ভুলতে পারল না সে খোকনের রুগ্ন চোখের করুণ মিনতি—যে মিনতিকে অগ্রাহ্য করেই বেরিয়ে পড়েছিল গোলাপ, আর অভিমানক্ষুব্ধ খোকন সে-অবহেলার চরম প্রতিশোধ নিয়েছিল।

বলাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আজ তার খোকনের কথাই মনে পড়ছিল। বলাইয়ের রোগশয্যার পাশে বসে সে যেন নিজের অপরাধ স্খালন করছিল, প্রায়শ্চিত্ত করছিল। এই কচি কিশোর ছেলেগুলো এখানে একেবারে অসহায়—কেউ দেখবার নেই। অসুখ হ'লে সবাই ভাবে 'আপদ' ভাবে ছেলেটার 'অপরাধ'।

ভাবনার স্রোতে বাধা দিয়ে একটা ছেলে এসে খবর দিল, 'গোলাপদা, খেয়ে নাও গে যাও।'

গোলাপ উঠে খেয়ে এল। বলাই তখন ঘুমোচ্ছে। জ্বরটা বোধহয় কমেছে।

গোলাপ নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়ল। মনের মধ্যে ভাবনার স্রোতটা আবার স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে।

'কি গোলাপবাবু—একটু বেরোবে নাকি?' নগেন—একজন সহকর্মী—বলল কথাটা। প্রৌঢ় মন্ত্রী ইত্যাদির পার্ট করে। সেজেগুজে কোথায় যেন চলেছে।

গোলাপ অন্যমনস্ক ছিল ; প্রশ্ন করল, 'কোথায় ?'

নগেনের সঙ্গে ছিল যজ্ঞেশ্বর। বিরাট ভুঁড়ি তার—বোধহয় সেই মূলধনেই ভাঁড়-জাতীয় পার্ট করে।

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'কোথায় যাচ্ছি, জানই তো, বাওয়া।' সব দাঁতগুলো দৃশ্যমান ক'রে হাসল। 'চল মাইরি—একটু ফুর্তি-ফার্তা ক'রে আসা যাবে।'

'না ভাই, আমার হ'য়ে উঠবে না। তোমরা যাও।'

'গোলাপটা এই বয়সেই বুড়িয়ে গেল—ছুৎ! একটু ইয়েটিয়ে দরকার—মেজাজটা একটু ঝালিয়ে নিতে হবে তো।'

'থাক্। তোমরা যাও।'

'যাব তো বটেই। তবে কি জান গোলাপবাবু, ঐ কচি ছেলেগুলোকে কচ্‌লে মেজাজ তৈরী হয় না—ওগুলো বড় জোলো।'

কথাটায় কুৎসিত ইঙ্গিত ছিল। গোলাপ চুপ ক'রে রইল।

'চল হে, যজ্ঞেশ্বর। গোলাপবাবুকে গোলাপ-বৌদির কথা ভাবতে দাও।'

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'জানো নগেন, ভালোমানুষ দেখলে আমার কিরকম গা গুলোয়।'

গোলাপ বুঝতে পারে, একটা তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে। সে ওদের ডেকে এনে ঝগড়া করছে না, বা ওদের কোন কাজে বাধা দিচ্ছে না, তবু হচ্ছে। একটু হালকা ক'রে দেবার জন্যেই বলল, 'না হে, আমি খুব ভালো লোক নই। তবে ঐ যে গোলাপ-বৌদির কথা বললে না ?—ওঁর ঝাঁটাটিকে বড় ডরাই।'

'আরে হ্যাঃ, বিয়ে যেন আর আমরা করি নি। নে, চল্।'

ওরা চলে গেল। 'ভালোমানুষ' ব'লে ওরা গোলাপকে ব্যঙ্গ করে। গোলাপ অবশ্য সেই তুলনায় তত খারাপ মানুষ মনে করে না ওদের ; দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সে জানে যাযাবর-জীবনের অভিশাপ—প্রবৃত্তির আগুনে ইন্ধন জোগায় নিঃসঙ্গ সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীবন।

অনর্থক ওরা মনটা একটু খিঁচড়ে দিয়ে গেল। বিয়ের কথাটা ওরা কেমন একটা অবহেলার সঙ্গে বলল! বৌর সম্পর্কে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছড়িয়ে রয়েছে কথাটায়। আবার গোলাপকে উপদেশ দিয়ে গেল গোলাপ-বৌদির কথা ভাববার।

সত্যি, সাগর এখন কি করছে কে জানে! এইসব সময়গুলোতে খুব একলা বোধ করে নিশ্চয়ই। গোলাপের তবু নানা কাজের মধ্যে থাকার সুবিধাটা আছে। সাগর তো সেদিক থেকেও নিঃসঙ্গ। এই মুহূর্তে একটা

বেদনা-মিশ্রিত আবেগ জেগে উঠল গোলাপের মনে। যদি এখন সে তাকে কাছে পেত, এই ক'দিনের সব কথা ওকে বলত; উত্তরা-অভিমন্যুর অভিনয়, দাসমশাই, বলাইর অসুখ—সব কথা; না, নগেন-যজ্ঞেশ্বরের কথা সে আনত না। সাগরীর দেহকে ঘিরে সে মুছে দিত তার নিঃসঙ্গতা; তার মনের কাছে মৃদুকণ্ঠে নিয়ে যেত কত শত উজ্জ্বল মুহূর্তের সঙ্গ। কাল লালগোলা যাবে—সেই কথাই হয়তো উঠত। সেখানে সাগরীর শৈশব কেটেছে, কেটেছে কৈশোরের দিনগুলো। সেই সময়টা তবু গোলাপের বিশেষ পরিচিত নয়—সাগরীর মুখে শুনে শুনে যতটুকু পরিচয়। যেদিন বসন্তর সঙ্গে গোলাপ গিয়ে হাজির হ'ল সাগরীদের বাড়ী, সেদিন থেকে দুজনের জীবন একটি সাধারণ খাতে আসতে সুরু করেছে। উঠত হয়তো সেদিনের কথাও।

সেবারও ওরা দুজনে—গোলাপ আর বসন্ত—মুর্শিদাবাদে এসেছিল যাত্রাদলের সঙ্গে। কাজকর্ম চুকিয়ে দল যখন কলকাতা যাবে, তখন বসন্ত বলল, 'চ' গোলাপ, লালগোলায় আমার মেসোর বাড়ী আছে, ওখানটা একবার বেড়িয়ে যাই।'

গোলাপের রাজী না হবার কোন কারণ ছিল না। দুজনে চলে এলো।

মেসোমশাই হরগোবিন্দ আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন: 'এসো বাবা, এসো।' তারপর দিলেন তাঁর দারিদ্র্যের পরিচয়—আতিথ্যের ক্রটি-বিচ্যুতির আশঙ্কা ক'রে।

এ কথাগুলো হরগোবিন্দের শুধু ভদ্রতা নয়। আর্থিক দিক দিয়ে জীবনে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়েছেন, সেই ব্যর্থতার হতাশা তাঁর সারাটা জীবনের ওপরে একটা হীনমন্যতার ভাব ছড়িয়ে দিয়েছে; আর্থিক দৈন্য তাঁকে দিয়েছে আত্মিক দুর্বলতা ও ভীরুতা। কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্যে সব সময়ই আছে একটা ভয়-ভয় ভাব। জীবনে কোনদিন কোন অপরাধ করেননি তিনি, অথচ মুখের চেহারায় সব সময়ই একটা অপরাধী-ভাব।

এক ক্ষুদে জমিদারের অধীনে গোমস্তার কাজ করেন তিনি। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চলে।

বসন্তর মাসীমা মারা গেছেন অনেকদিন—দুটি ছেলে-মেয়ে রেখে। বড় সাগরী—তখন বছর আঠারো বয়স—হরগোবিন্দের চিন্তার কারণ।

মহেশ—সাগরীর চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট ; পড়াশুনোটা সবে ছেড়েছে, চাকরিটা তখনও ধরতে পারেনি।

সংসারের দায়িত্ব স্বভাবতই সাগরীর ওপর। গোলাপরা অতিথি এই সংসারে। লজ্জা-সংকোচ সত্ত্বেও সাগরীর দূরে থাকা সম্ভব ছিল না।

খাবার সময় পরিবেশন করত সাগরী—আর তাকে নাজেহাল ক'রে ছাড়ত বসন্ত। প্রতিটি রান্নারই সে খুঁত বার করত। সাগরী অস্বীকার করলে, সাক্ষী মানত গোলাপকে। গোলাপ বলত, 'বেশ ভালোই তো হ'য়েছে।'

তাতে সাগরীর নিস্তার ছিল না। বসন্ত বলত, 'ভদ্রতা করছে গোলাপ। তবে তুই দেখে নিস সাগর, ও জন্মে আর এ-বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবে না, এবার বেঁচে বেরোতে পারলে হয়।'

গোলাপ অনেক সময় সাগরীর পক্ষ নিয়ে বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ক্রমে যে-কোন প্রশ্নেই ওরা থাকত একদিকে, আর বসন্ত অন্যদিকে। মহেশ কাছাকাছি থাকলে সে সাধারণত বসন্তর পক্ষই নিত। এই অলিখিত মৈত্রীচুক্তিতে সূক্ষ্ম একটা মিতালি গড়ে উঠল সাগরী ও গোলাপেতে। রাত্রে ঘুমোবার আগে এই মিতালির কথা ভাবতে ভালো লাগত তার।

ফরসা-মতো মুখখানা উনুনের আঁচে একটু লাল, কাজেকর্মে ঈষৎ ঘর্মাক্ত, গোছা গোছা অবিন্যস্ত চুলে ঘেরা। চোখের দৃষ্টি সলজ্জ, করুণ; চোখের কাজলরেখাটি সেইজন্যে মনে হয় সজল। হাসলে তাই বিচিত্র দেখায়। ছোটখাটো গড়ন—নারীসুলভ লালিত্যে কমনীয়। হালকা দেহ—লোকের চোখের আড়ালে চলাচল তার ক্ষিপ্র, কিন্তু হঠাৎ কারুর সামনে পড়লেই লজ্জার ভারে মন্থর হ'য়ে যায়। চাপা ধরনের মেয়ে—কথা বলে কম, নিজের সম্বন্ধে একেবারেই নয়।

সাগরী মুখ খোলে শুধু একজনের কাছে। পাশের বাড়ীর মেয়ে পারুল—সে তার হৃদয়ের সকল গোপনতার ভাণ্ডারী। অনেক সময়েই দেখা যায় তাদের দুজনকে একা।

পারুলের তখন সদ্য বিয়ে হ'য়েছে। স্বামী চাকুরির জায়গায় একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই সে চলে যাবে। স্বভাবে সে সাগরীর মতো অত লাজুক নয় ; তা ছাড়া বিবাহিত ব'লে সংকোচ তার আরও কম। অত্যন্ত সহজ সে গোলাপ ও বসন্তের সঙ্গে ব্যবহারে। তার মুখর ঠাট্টা-হাসি গল্প-গুজবের সেতুপথে গোলাপ সাগরীর আরো কাছে এসে পৌছেছিল।

মনে আছে, পারুলের সরব ও সাগরীর নীরব অনুরোধে গোলাপ আর

বসন্ত একদিন 'নল-দময়ন্তী' থেকে খানিকটা অংশ অভিনয় ক'রে শুনিয়েছিল ওদের। তখন ঐ পালাটায় গোলাপদের দলের খুব নাম। বসন্ত কচি দেখতে ছিল সে-সময়—ও মেয়েদের পার্ট করত।

দুই সখীতে থ' হ'য়ে দেখল অভিনয়। শেষে দুজনে দুজনের দিকে চোখ বড়-বড় ক'রে তাকিয়ে হাসির দমকে ফেটে পড়ল। সাগরী মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে বলল, 'থাম্, মুখপুড়ী।' থামার বদলে দুজনেরই কিন্তু নতুন হাসির দমক এল। তখন দুই সখীতে ছুটে চলে গেল ওদের সামনে থেকে। এত হাসির কারণটা কী, তা গোলাপ বা বসন্ত আজো কেউ জানে না।

হরগোবিন্দ বসন্ত ও গোলাপ দুজনকেই সাগরীর জন্য একটি ছেলে দেখে দেবার কথা বলেছিলেন। বৃদ্ধের ঐটেই তখন সবচেয়ে বড় চিন্তা।

বোধহয় এই সূত্র ধরেই বসন্ত অত্যন্ত দ্বিধান্বিত অবস্থায় গোলাপের কাছে প্রস্তাবটা করল। অনেক ইতস্তত করার পর বলেছিল কথাটা: 'ভাবিস্‌নে যে তোকে আনবার সময়ই এই মতলবটা মনে ছিল—অনেকদিনের বন্ধু আমি তোর, আমায় তুই ভালো করেই চিনিস, তবু বলতে হচ্ছে কথাটা, কারণ ব্যাপারটা বড় ইয়ে—'

গোলাপের বুকটা ধীরে ধীরে তখন কাঁপতে সুরু করেছে, মাথার মধ্যে নানা চিন্তার জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

গোলাপকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বসন্ত বলল, 'ভ্যাখ্, আমার কাছে কিছু লুকোসনি, কিছু লজ্জাও নেই।'

গোলাপ বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। না, লজ্জা নয়, অন্য কথা, অন্য বাধা। কিন্তু বসন্তও তো জানে না সে-কথা।

বসন্ত তখনও ব'লে যাচ্ছিল: 'তোর অমত হ'লেও, স্পষ্ট ব'লে দিবি, তাতে তোর আমার মধ্যে কিছু এসে যাবে না। তোর সংসারে কেউ নেই—তোর ছন্নছাড়া ভাব দেখেই···কি, কোন কথা বলছিস না যে?'

'উঁ'—গোলাপ যেন সদ্য জেগে উঠল।

'কী ভাবছিস?'

সেই ভাবনার পাথরটা গোলাপের বুকের ওপরে চেপে বসেছে—সেটাকে সরাবার জন্মেই জোর ক'রে একটু হাসল, সে-হাসিতে প্রাণ ছিল না, বরং পাথরের গুরুভারে যেন পিষে গেল হাসিটা। বলল, 'আমাদের এই ছন্নছাড়া চাকরী ক'রে কি বিয়ে করা যায়?'

'অসুবিধে আছে তো বটেই। আমাদের তো ওরই মধ্যে করতে হবে।

যাত্রাদলের লোকও তো বিয়ে করে—তুই-ই তো আর প্রথম করছিস না।'

গোলাপ কোন উত্তর দিল না।

বসন্ত বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব—ঠিক উত্তর দিবি ?'

'শুনি তো।'

'সাগরকে তোর কেমন লাগে ?' বসন্ত বলেছিল, 'যদি ভালো না লাগে, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু ভালো লাগলে, মিথ্যে ঐ চাকরীর কথা তুলে নিজেকে ঠকাসনে।'

তবু চুপ করেই রইল গোলাপ। নিজেকে তার ঠকাতে হবেই, এবং মিথ্যে অজুহাত তুলেই। ভালো লাগে না—এ-কথা তো বলাই যায় না। তার এ ক'দিনের সমস্ত ব্যবহার যে এরই মধ্যে এর বিরুদ্ধে কথা ব'লে বসে আছে—সেটা বসন্তর চোখ এড়ায়নি নিশ্চয়ই।

'সাগরীকে বিয়ে করলে সুখী হবি তুই।'

জানে গোলাপ এ-কথা। তবু এ-কথা থাক্। সে-সুখ তার কপালে নেই। দুস্তর বাধা আছে। বাধাটার সম্পর্কে সে সচেতনই ছিল না এতদিন, প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

'ওসব কথা এখন থাক্, বসন্ত।' আকস্মিকভাবে প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দিল গোলাপ। একটু নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার।

পরের দিন পারুল এক কাণ্ড ক'রে বসল।

সকালবেলা। হরগোবিন্দ গিয়েছে কাজে, মহেশ আড্ডায়। বসন্ত বেড়াতে বেরিয়েছে ; গোলাপকেও ডেকেছিল, গোলাপ যায়নি—মেজাজটা ঠিক নেই তার, চিন্তার ঝোড়ো অস্থিরতার পর এখন মনের ওপর ধীরে ধীরে নামছে বিষাদের কুয়াসা। একা চুপচাপ সেই কুয়াসার শৈত্যের মধ্যে জড় হ'য়ে বসেছিল সে। ভাবছিল, কোলকাতা ফিরবে। এই জায়গার বাইরে গিয়ে একটু ভালো ক'রে ভেবে দেখতে হবে। এখানে সাগরী এত প্রত্যক্ষ যে, চিন্তা-ভাবনাগুলো এলোমেলো হ'য়ে যায়। এই একটু আগেও শোনা যাচ্ছিল সাগরী আর পারুলের কলগুঞ্জন।

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ। সাগরী। লজ্জার স্তিমিত স্বরে উৎকণ্ঠা : 'আপনার কি শরীর খারাপ ? দাদার সঙ্গে বেরোলেন না যে ?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

'মাথা ধরেছে নাকি ?'

কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি—তাই মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। কিন্তু সাগরী জানল কি ক'রে—আশ্চর্য! সাগরীর প্রশ্নের আগে সে নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। জিজ্ঞেস করল, 'কি ক'রে বুঝলে?'

সাগরীও একটু সলজ্জ হেসে বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে।'

'না, মাথা-টাথা ধরেনি। এমনিই শরীরটা ভালো লাগছে না।'

'আমি বলতে পারি আপনার কি হয়েছে।'

গোলাপ হাসল: 'কি?'

'আপনার বাড়ীর জন্যে মন-কেমন করছে।'

'বাড়ী!' করুণ হাসি ফুটে উঠল। সাগরী জানে না যে তার বাড়ী ব'লে কোন পদার্থই নেই।

'চলুন। পারুল এসেছে, ও ডাকছে। চিঠি এসেছে আজকালের মধ্যেই ওকে এসে নিয়ে যাবে।'

'কে নিয়ে যাবে?' অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্নটা করেছিল গোলাপ।

সাগরী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ফেলল: 'কেউ নয়। উঠুন—'

একটু অপ্রস্তুতভাবে গোলাপও হেসে ফেলল এবার।

'রান্নাঘরে আমার কাজ আছে। ওখানেই বসবেন চলুন। তিনজনে গল্প করা যাবে। বাড়ীর দুঃখ অবশ্য সারানো যাবে না, তবে এক কাপ চা ক'রে দিলে মাথাধরা-টা সারতে পারে।' ঠাট্টার সুরে হেসেই বলল সাগরী।

উঠে সাগরীর সঙ্গে এগিয়ে এল দরজার দিকে। একি, দরজাটা বন্ধ যে! পারুল বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছে।

সাগরী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজাটার ওপর। খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। 'পারুল, পারুল!'—আর্ত চীৎকার করল সে।

দূর থেকে পারুলের গলা শোনা গেল: 'মা ডাকছে, শুনে আসছি। দাঁড়া।'

সাগরী আর একবার ডাকল: 'পারুল, শোন্।' কোন সাড়া না পেয়ে নিস্ফল ক্ষোভে দরজার কড়াটা মোচড়াতে লাগল। সমস্ত মুখটা লাল হ'য়ে উঠেছে।

পেছনে গোলাপ—স্তব্ধ ও বিহ্বল; দেহটা সম্পূর্ণ নিশ্চল—বলতে গেলে অসাড়। তার চোখের সামনে কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো একরাশ চুল; সদ্য স্নান সেরে এসেছে সাগরী—সারাটা পিঠের ওপরে ছড়ানো ভিজে

চুল। একরাশ ঢেউয়ের মতো। সেই ঢেউ যেন হালকাভাবে তাকে ধাক্কা দিচ্ছে—ভিজে চুলের গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে তার বুকের প্রতিটি দিগন্তে এসে পৌঁছেছে।

সাগরীর ক্ষুব্ধ হাতের মোচড়ে কড়াটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করছে। গোলাপের মাথার মধ্যে চিন্তা-ক্লিষ্ট রাতের দপ্‌দপানি।

কিছু বলা দরকার, যাতে সময়টা একটু হালকা হয়, পারুলের ইঙ্গিত থেকে মুক্ত হ'য়ে সহজ হয়। সেই উদ্দেশ্যেই জোর ক'রে একটু হাসল গোলাপ: 'আচ্ছা মেয়ে তো পারুল!'

একটা ইঙ্গিতকে সরাবার জন্যে কথাটা বলা; কিন্তু কথাটা এত কৃত্রিম ও বানানো মনে হ'ল যে ইঙ্গিতটাই তাতে তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল।

চুপ ক'রে গেল গোলাপ। তাতেও অস্বস্তি বাড়ল বই কমল না। তখন আর একবার চেষ্টা করল কথা বলবার। আশ্চর্য! এই একটু আগেও কেমন সহজে কথা বলছিল তারা!

হালকা সুরে বলল, 'যাক্‌গে। কি আর হ'য়েছে! বস।'

সাগরী কিন্তু সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। আবার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দতা চেপে বসতে লাগল। গোলাপ আবার কথা খুঁজতে লাগল।

নাঃ, থাক্, আর সে এ কৃত্রিমতা সহ্য করতে পারছে না। বলল, 'পারুল আমাদের আট্‌কে রেখেছে কেন জান?'

উত্তরের অপেক্ষা করারও দরকার ছিল না তখন গোলাপের। হঠাৎ কি ক'রে যেন তার ভিতরের সব বাধা মুহূর্তে অপসারিত হ'য়ে গেছে।

সে একটু এগিয়ে এল। বলল, 'পারুল যখন জানে, তখন তুমিও জান।··· তোমার মতটা আমি জানতে চাই। বল!'

সাগরী দরজার সঙ্গে আরো যেন মিশে যেতে চাইল। কড়ার ওপরে তার হাত-দুটো।

কাঁধের কাছটা ধরে তাকে ঘুরিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল গোলাপ: 'বল সাগর, বল। চুপ ক'রে থেকো না।'

সাগরী নিজেকে ছাড়াবার ক্ষীণ একটা চেষ্টা করল। আর বলবার দরকার নেই। তার অস্থিরতা, তার লজ্জা, তার অরুণাভ মুখের দীপ্তি, তার কাঁপা-কাঁপা হাত অনেককিছু বলল। তীব্র একটা খুশীর উত্তেজনায় এখন কী করণীয়, গোলাপ ভেবে পেল না।

শিথিল হ'য়ে গেছে সাগরীর সকল অস্থির প্রয়াস। চোখ নিচু করে

দাঁড়িয়ে আছে। কী ভাবছে সাগরী! তার নত চোখের দিকে তাকাল গোলাপ। তার চোখের কোণে কি-যেন চিকচিক করছে—জল?

সাগরীর কপালটা ধরে মুখটা একটু তুলল্ সে। চকিতে একবার গোলাপের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল সাগরী, মুখটা দ্রুত ঘুরিয়ে নিল। চোখের পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা জল।

'তুমি কাঁদছ, সাগর!'

সাগরী আঁচলে মুছে নিল চোখ। বলল, 'ছাড়ুন!'

ছাড়ুন! এখনও 'আপনি' বলছে সাগরী! একটু অভিমানের ভাব এল তার মনে। অভিমানের জন্য তো একটা অধিকার আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার—সে অধিকার কতটা তার আছে? আবার সেই দুশ্চিন্তাটা একটু একটু ক'রে মাথা চাড়া দিচ্ছে—জোয়ারের জল সরে যাবার পর যেমন ধীরে ধীরে চড়াগুলো দেখা দেয়।

সাগরীর বাহুতে তার যে হাতখানা ছিল, সেখানা কিন্তু সে সরাতে পারল না। শুধু বাড়তে লাগল মানসিক যন্ত্রণাটা। এ কি করল সে! যে-জায়গা থেকে পিছু হটবার চেষ্টায় ছিল সে, সেই জায়গার দিকে মস্ত বড় একটা পদক্ষেপ ক'রে ফেলেছে। এই অবস্থায় সাগরীর মত জানতে চাওয়ার অর্থ তো নিজের সম্মতি ঘোষণা করা। আজ এই মুহূর্তে পারস্পরিক সম্মতির যে অদৃশ্য ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল, তার থেকে তার নিষ্কৃতি হবে কেমন ক'রে! সেই পিছল পথে পা দিয়ে ফেলেছে সে, যেখানে পরিণতি পর্যন্ত না গিয়ে থামা যায় না।

এই অদৃশ্য দলিলের খবর সাগরী অবশ্য কাউকে বোধহয় বলবে না—সেই চোরাপথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে শেষ পর্যন্ত? না, সাগরীর প্রতি এ অন্যায় সে করতে পারবে না। ছি ছি, সাগরীর গায়ে হাত রেখে সে একথা ভাবছে কি ক'রে!

কিন্তু এ যে দু'নৌকায় পা দেওয়া হ'য়ে গেল। অন্যায় হ'ল, অন্যায় হ'চ্ছে দেহস্পর্শের প্রতিটি মুহূর্তে!

দরজার শেকলটা বেজে উঠল। বাইরে থেকেই পারুল বলল, 'খুলব নাকি?'

সাগরী দরজাটা খুলে ছুটে বেরোল পারুলকে মারতে: 'মুখপুড়ী, অসভ্য!'

আত্মরক্ষার তাগিদে পারুল সাগরীর হাতটা ধরল চেপে। বলল,

'আর আমায় মারিসনে, সাগর। আমি আপদ আজই দূর হ'য়ে যাব তোদের কাছ থেকে।'

'কেন রে!' থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সাগরী।

মুহূর্তে আবহাওয়াটা পাল্‌টে গেল।

'সেই লোকটা এসেছে।'

গোলাপ বোকার মতো প্রশ্ন করল, 'কে?'

চকিত হাস্তে সখীরা একবার চোখাচোখি ক'রে নিল।

পারুল বলল, 'যে লোকটা আমায় নিয়ে যাবে।'

সাগরী বলল, 'হতভাগা লোকটা এসে ভালোই করেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবে কেন?'

'পরের চাকরী তো।'

সাগরী পারুলের কোমরটা জড়িয়ে ধরল: 'আজই যাবি?'

পারুল করুণ হেসে বলল, 'কি করব! সমন এসেছে যে।'

'ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে বুঝি?'

'চলি রে, সাগর। পরে আসব। লোকটা এখনও জামা-কাপড় ছাড়েনি। এখন এখানে আসাই মুশকিল ছিল, নেহাত এ বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ছিল ব'লে—' দুষ্টু হাসি হেসে দ্রুত পায়ে চলে গেল পারুল।

গোলাপের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সাগরীর মুখে একরাশ লজ্জা ছুটে এল। হালকা দেহে সে যেন উড়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

গোলাপের বুকটা কাঁপছিল খুশীতে, উত্তেজনায়, দুশ্চিন্তায়। একি ক'রে ফেলল সে! সাগরী যে তার ওপর বিশ্বাস করে বসে থাকবে। যেদিকেই এখন গোলাপ যাক, একটা দিকে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবেই।

অসহ্য হ'য়ে উঠছে। বসন্তের সঙ্গে দেখা হ'লে গোলাপ বলল, 'চল, কোলকাতা যাব।'

'একটু দেরী কর। আজ পারুল চলে যাচ্ছে। আজকেই আমরাও চলে গেলে, সাগর বেচারা হঠাৎ বড় একা হ'য়ে পড়বে।...আচ্ছা, সাগরের ঐ ব্যাপারটা কী ঠিক করলি? তোর আপত্তি থাকলে স্পষ্ট ক'রে—'

'ওসব কথা কোলকাতা গিয়ে হবে।'

বিকেলের দিকে পারুল চলে গেল তার বরের সঙ্গে। যাওয়ার আগে দু' সখীতে জড়াজড়ি ক'রে ছেলেমানুষের মতো কাঁদল।

পারুল গোলাপকে ব'লে গেল, 'অনেক জ্বালাতন করেছি, রাগ করবেন না যেন। আমার ওপরে অবিশ্যি একটু করলেও করতে পারেন, কিন্তু এ-বাড়ীর কারুর ওপর রাগ করতে পারবেন না, ওরা কোন দোষ করেনি।'

চোখের জলের সঙ্গে কৌতুকের হাসি মিশে সে এক বিচিত্র পারুল। মাত্র ক'দিনের পরিচিত এই মেয়েটির বিদায়ে গোলাপেরও একটু কষ্ট হ'ল। এই ক'টা দিন কী আনন্দে মিশে ছিল সবাই! এখন একে একে যাবার দিন আসছে সবার।

পারুল গেল, গোলাপ-বসন্তও তারপর গেল, শুধু পড়ে রইল সাগরী একা—আগের চাইতেও অনেক বেশী একা।

কোলকাতায় এসে বসন্ত জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

'সাগরীকে বিয়ে করা আমার সম্ভব নয়।' কথাটা বলতে বুক কাঁপল গোলাপের, মনে পড়ল বন্ধঘরের দৃশ্যটা।

'কেন?' আশ্চর্য হ'ল বসন্ত।

চুপ ক'রে রইল গোলাপ। যে-কথা কোনদিন কাউকে গোলাপ বলেনি, আজ তাই বলতে হবে। হ্যাঁ, বলতে হবে। চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

'বসন্ত, আমি বিবাহিত।' নিজের কানেই অদ্ভুত শোনাল কথাটা।

বসন্ত একটু বোধহয় চমকেই উঠল, বিমূঢ় বিস্ময়ে তার ঝুলে-পড়া চোয়াল থেকে একটি শব্দ বেরুল, 'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ।'

'কবে তোর বিয়ে হ'ল?

'সাত-আট বছর আগে।

'কোনদিন শুনিনি তো।'

'আমি বলিনি—বলবার দরকারই হয়নি। সেটা আসলে মোটেই বিয়ে ছিল না।...কিন্তু মন্ত্র পড়ে সবকিছু হ'য়েছিল।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। খুলে বল্।'

'হুঁ, খুলেই বলব।'

রাজপ্রাসাদের ঘর। খুব ধীরে স্তিমিত গতিতে সাগরীর সময় চলে। এইতো সেদিন গেল গোলাপ, এতদিনে হয়তো বাবার সঙ্গে দেখা করেছে। বাড়ীর সব কে কেমন আছে কে জানে! পারুল এখন কোথায়, বাপের বাড়ীতে থাকলে গোলাপের সঙ্গে দেখা হবে। পারুলের ছেলেটা বেশ

হয়েছে—সাগরীর খোকনের প্রায় সমবয়সী। অনেকদিন দেখা হয় না পারুলের সঙ্গে।

দুপুর। রুনু গিয়েছে স্কুলে। ঝুনু ঘুমোচ্ছে। ছোটবৌ দোতলায় নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ছোটবৌর দেওয়া মালাটা দেওয়ালে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল সাগরী; এখন শুকোচ্ছে মালাটা।

জানালার বাইরে একফালি জমি। এখানে একটু মাটি দেখা যায়, ঘাড় কাত করলে একটু আকাশ। জমির মালিক নাকি শীগ্‌গিরই এখানে বাড়ী তুলবে, শোনা যাচ্ছে।

লাল রঙের খেরোর খাতায় গোলাপের লেখা কয়েকটা যাত্রার বই আছে। সেগুলোর ওপরে একটু চোখ বোলাল সাগরী। না, এগুলো তার তেমন ভালো লাগে না। সাগরী গোলাপের জীবনে আসবার আগে লেখা এগুলো —এগুলোতে ঘুণাক্ষরেও সাগরী নেই। কৌতূহলের বশে আগে পড়েছে এগুলো—এখন পুরানো হ'য়ে গেছে।

আশ্চর্য, চিঠিগুলো কিন্তু পুরানো হয় না। খোকনের টিকলী রাখার বাক্সর পাশ থেকে বার করল সে-চিঠিগুলো। বাণ্ডিলের প্রথম চিঠিখানা গোলাপের, কিন্তু সাগরীকে লেখা নয়, লেখা তার বাবাকে। সাগরীদের বাড়ী থেকে দুই বন্ধু ফেরবার পর সৌজন্যসূচক চিঠি এটা।

সাগরী যখন উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় প্রহর কাটাচ্ছে, তখন এসেছিল নিতান্ত ভদ্রতার এই চিঠিটা—হরগোবিন্দকে লেখা: '···আমরা দুজন ভালোভাবেই পৌঁছেছি। ট্রেনে খুবই ভীড় ছিল। শোয়া তো দূরের কথা, বসাও মুশকিল ছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বসতে পেরেছিলাম। আপনাদের ওখানে খুব আনন্দে কয়েকটা দিন কাটল—অনেকদিন মনে থাকবে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন ও ছোটদের স্নেহাশিস জানাবেন।'

পোস্টকার্ডে লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠি।

বাণ্ডিলের দ্বিতীয় চিঠিখানা বসন্তর লেখা—এটাও হরগোবিন্দকে। একই দিনে এসেছিল চিঠি দুটো। বসন্ত লিখেছে: '···মেসোমশাই, সাগরীর জন্যে পাত্রের সন্ধানে আছি। খোঁজ পেলেই আপনাকে জানাব। আপনি বেশী দুশ্চিন্তা ক'রে শরীর খারাপ করবেন না। আমরা পাঁচজন যখন আছি, তখন ভগবানের কৃপায়···'

সাগরী মুড়ে ফেলল চিঠিটা। ওঃ, কিসব ভগবানে ভক্তি! চিঠি দুটো যেদিন সাগরী প্রথম পড়ে, সেদিন বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সবাই ইচ্ছে ক'রে

সাগরীকে যেন বাদ দিয়ে গেছে চিঠিতে। 'ছোটদের' কথাটার মধ্যে কোথায় একটু পরোক্ষে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে—সেটুকু না-দিলেই ভালো হ'ত।

তবু সাগরী আশা করছিল, শীগ্‌গিরই কোন শুভ সংবাদ নিয়ে চিঠি আসবে। পারুলের বন্দী ক'রে রাখাটা মনে পড়ত খুব। ছি ছি, কী লজ্জা—পারুলটা এমন! কিন্তু সে-মানুষটাই বা কেমন—ঘরের মধ্যে একা পেয়ে যে অতগুলো কথা শোনাল! আর সে-কথাগুলোও বেমালুম ভুলে বসে আছে বোধহয় এতদিনে। পুরুষজাত সম্পর্কে তখন সাগরীর ধারণা খুবই কম; ভাবল, পুরুষজাতটাই বোধহয় এমনি। কোলকাতায় কত বড় বড় আকর্ষণ, সেখানে একটা গেঁয়ো মেয়ের কথা কে মনে রাখবে!

মনের দুঃখ চেপে রাখা ছাড়া সাগরীর উপায় ছিল না। পারুলটা থাকলে তবু মনের বোঝা একটু হালকা করা যেত—সে তো আগেই গিয়েছে। বড় একা মনে হচ্ছিল নিজেকে। কতদিন স্বপ্ন দেখল, গোলাপ এসেছে নিজেই—তাকে নিতে। স্বপ্নে তাকে দেখামাত্রই ঘুম ভেঙে যেত। জেগে এত কষ্ট হ'ত! চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত। নাঃ, জীবনে তার কেউ নেই!

বেশ কয়েক মাস কেটে গেল এমনিভাবে। তারপর হঠাৎ এল বসন্তর চিঠি: '…মেসোমশাই, একটি পাত্র পেয়েছি। পাত্রটি রূপে-গুণে চমৎকার। আমি তাকে অনেকদিন ধরে চিনি। আপনিও জানেন তাকে। আমার বন্ধু গোলাপ। আপনার এমন ইচ্ছে তো ছিলই, সাগরেরও হয়তো খুব অপছন্দ হবে না।'

সাগরী ভেবে পেল না, গোলাপের মন স্থির করতে এত দেরী হ'ল কেন।

বিয়ের পর জিজ্ঞেস করেছিল কথাটা।

গোলাপ বলেছিল, 'যাত্রাদলের মানুষ—টপ ক'রে কি বিয়ে করা যায়। বিয়ে একেবারে না করাই উচিত, কিন্তু তুমি যে সব বানচাল ক'রে দিলে। আমি তো একটা ঘর-পালানো বাউণ্ডুলে, সাতকুলে কেউ নেই—'

সাগরী গোলাপের মুখে হাত-চাপা দিয়েছিল: 'ও-কথা রোজ কেন বল—কেউ নেই! আমি কি তোমার কেউ নই?'

'হ্যাঁ, সাতকুলে না থাক্, অন্তত—'

সাগরী গোলাপের কৈফিয়তটা সরল মনে বিশ্বাস করেছে। না-করার কারণ ছিল না। বিয়ের পরে সে তো যাত্রাদলের লোকের জীবন দেখেছে।

কিন্তু প্রথম দুটো চিঠির মৌন ঔদাসীন্য ও তৃতীয় চিঠির প্রচ্ছন্ন সম্মতির

মধ্যেকার মাসগুলোর একটা ইতিহাস আছে। সত্যিই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল গোলাপ, কিন্তু যাত্রাদলের ভবঘুরে-বৃত্তি বা দারিদ্র্যের জন্য ততটা নয়, যতটা অন্য কারণে।

কিন্তু সে-কারণটা জানতে হ'লে আর একটু আগে থাকতে খেই ধরতে হবে।

গোলাপের বাপ-মা মারা যায় তার খুব ছেলেবেলাতে। মামার কাছে মানুষ গোলাপ। মামা বিপিন এই অবাঞ্ছিত অতিথিটিকে কোনদিনই সুনজরে দেখতে পারেনি। ভাগ্নেটা সংসারে অনধিকার প্রবেশ ক'রে ভাত-কাপড়ের অংশীদার হয়ে বসে আছে এটাকে মামা চিরদিনই জবর-দখল মনে করেছে। এমন কি লোকনিন্দার ভয়ে গোলাপকে স্কুলেও ভর্তি করতে হয়েছিল। কিন্তু মামার মনের মধ্যে একটা রাগ ছিল, মাঝে মাঝেই কারণে-অকারণে সেটার প্রকাশ ঘটত, অধম উক্তি থেকে উত্তম-মধ্যম পর্যন্ত সবকিছুরই প্রয়োগ করতো মামা, কিন্তু তবু যেন মনের ঝাল পুরো মিটতে চাইত না, সাময়িক নিবৃত্তি হ'ত মাত্র।

গোলাপও মোটেই শান্ত সুবোধ ছিল না, দুরন্তপনায় গ্রামে সে অদ্বিতীয়। লেখাপড়ায় মন ছিল না, পড়শীদের বাগানের ফল-ফলারি সম্পর্কে বিশেষ দুর্বলতা ছিল, সেগুলি আয়ত্ত করবার বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের অভাব ছিল না। সুতরাং মামার মনের ঝাল মেটাবার সুযোগ অহরহই থাকত।

অন্নদাতা মামাকে সে কোনদিন ভালোবাসেনি, শ্রদ্ধা করেনি। বরং যেন সূক্ষ্ম একটা বৈরীসম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। মামা যত শাসন করত, গোলাপ তত অবাধ্য হ'ত—যেন ইচ্ছে করেই, 'তোমায় মানি না'—এ-কথাটা নীরব ঔদ্ধত্যে ঘোষণা করবার জন্যেই। দুজনের মধ্যে একটি আড়াআড়ির সম্পর্ক ছিল—একের শাসন আর অন্যের অবাধ্যতা পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছিল।

এমন চলল বেশ কিছুদিন। তারপর দু'পক্ষই যেন একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল।

এই সময়েই গোলাপ প্রথমে এক যাত্রাদলের সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায়। সুদর্শন ও সুকণ্ঠ—সুবিধা ছিল তার।

মামা ভাবলো, 'যাক্, আপদ গেল।' বাইরে অবশ্য একটু লোক-দেখানো খোঁজখবর করলো, পড়শীদের কাছে একালের ছেলেদের নিন্দাবাদ ক'রে গায়ের ঝাল কিঞ্চিৎ মেটালো।

কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু মামাতো ভাইবোনদের।

পূর্ণ গোলাপের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, কিন্তু সম্পর্কটা দাদার নয়, বন্ধুর।

পূর্ণর পর দুই বোন। ইন্দু গোলাপের সমবয়সী। আর বিন্দু গোলাপের চেয়ে ছোট। তাদের চোখে গোলাপ একটা 'হিরো'। গোলাপ পড়া পারে না, পারবার বিশেষ চেষ্টাও করে না, ক্লাসের সভাস্থলে পণ্ডিত মশাইকে বোকা বানায়, পড়শীদের বাগানে চুরি করে, চোরাই মাল লুকিয়ে এনে ভাইবোনদের খাওয়ায়, মজার কথা বলে, গান গাইতে পারে—এসবের একটা মোহাঞ্জন ইন্দু আর বিন্দুর চোখে লেগে ছিল। পূর্ণরও ছিল, তবে পরিমাণে এত বেশী নয়।

সর্বকনিষ্ঠা সোনা, তার কান্নাও মার চেয়ে গোলাপের কাছে এলে চট ক'রে থামে। মামী গোলাপকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে, 'ছোড়া গুণ জানে!'

মাসখানেক পরে দলের অধিকারীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গোলাপ ঘরে ফিরে এল। পালিয়েছিল বা ফিরল দুটোর যে-কোন একটা কারণে মামা তার পিঠের ওপর দু'খানা লাঠি ভেঙে ফেলল। সে-আঘাতে পূর্ণর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, ইন্দু-বিন্দু-সোনার চোখের জল। নিভৃতে তারা শুনল গোলাপের অভিযানের কাহিনী, মোহিত হয়ে গেল। যাত্রাদলের অভিনেতা, যারা কিরকম সব ঝক্‌ঝকে পোশাক পরে, সুদূর দেশের কল্পলোকে বাস করে, সাজঘরের ফাঁক দিয়ে যাদের দর্শনলাভ দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার, সেই তাদেরই একজন তাদের ভাই—একসঙ্গে মানুষ হয়েছে, গল্প করেছে, হেসেছে, খেলেছে, এত কাছাকাছি বসে এই মুহূর্তে কথা বলছে, আশ্চর্য!

মামী বিরক্তির সঙ্গে আর চারটি করে চাল নিতে লাগল ভাতের হাঁড়িতে।

কিন্তু বেশীদিন তা নিতে হ'ল না। রইল না গোলাপ বেশীদিন। যাত্রার নেশাটা তার রক্তের মধ্যে ঢুকতে সুরু করেছে তখন। তাছাড়া মামার শাসনের বিরুদ্ধতা তাকে করতেই হবে। যত শাসন, তত অবাধ্যতা—এই তার মামার সম্পর্কে নীতি। মামা পড়তে বললে, সে বরাবর বই বন্ধ করেছে,—বাজারে পাঠালে খেলা ক'রে ফিরেছে,—তাড়াতাড়ি আসতে বললে, সেদিন দেরী ক'রে ফেরা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সেই মামাবাড়ী থেকে পালিয়ে যাত্রাদলে যাওয়ার জন্যে মেরেছে,

অতএব তাকে আবার বেরোতেই হবে। দু'খানা লাঠি যখন ভাঙছিল পিঠে, তখনই সে সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছিল। নইলে যে মামার কাছে হার হ'য়ে যায়, হার হ'য়ে যায় দু'খানা লাঠির কাছে।

মাসকয়েক পরে আবার ফিরল গোলাপ। নানা গোলমালে তাদের দল ভেঙে গিয়েছে। তা ছাড়া, মামাতো ভাইবোনদের জন্যে একটু মন কেমন করছিল। তাদের দেখতে এল। আর এল দেখাতে—ভালো দু'একটা জামা-কাপড়, অর্থাৎ, হ্যাঁ, মামার বাড়ীর চেয়ে ভালোই ছিল সে।

মামা লাঠি দিয়েই অভ্যর্থনা করল। গোলাপ এর জন্য প্রস্তুত ছিল। নীরব উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় টান ক'রে সোজা মামার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। মামার হাতটা একটু শিথিল হ'য়ে এলো, একটি লাঠিও ভাঙতে পারলো না সেবার।

আরো দু'একবার সে বাইরে গেল। ফিরলও। কিন্তু প্রতিবারই দীর্ঘতর সময় বাইরে কাটিয়ে। মামার প্রহার ক্রমে গঞ্জনায় এসে ঠেকল।

গ্রামে মামাকেও গঞ্জনা কম সহ্য করতে হচ্ছিল না। সব লোক ধরেই নিয়েছিল, মামার দোষেই ভাগ্নেটা এমন বকে গেল। লোকে নিন্দে করত প্রথমে লুকিয়ে, পরে প্রকাশ্যে। বাংলার পূর্বাঞ্চল, এখানকার লোকের স্বজন-পোষণ মজ্জাগত, এ ব্যাপারে ত্রুটি কেউ ক্ষমার চোখে ত্থাখে না। সেই ভয়েও অনেক অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে দূর-আত্মীয়দেরও পুষতে হয়।

মামা ভদ্রলোক বড় মুশকিলে পড়ে গেল—মহা-নাজেহাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে। ছোঁড়াটা যদি একেবারে চলে যেত, তবে নিন্দেটাও ক্রমে ডুবে যেত। ছোঁড়াটা আবার বারবার মুখ দেখিয়ে যায়, তাতে লোকনিন্দার ভাঁটিয়ে-পড়া স্রোতটায় আবার জোয়ার আসে। হয় ছোঁড়াটাকে একেবারে বাইরে রাখতে হয়, নয়তো একেবারে ঘরে রাখতে হয়। প্রথমটা নিঃসন্দেহে ভালো, কিন্তু সেটা মামার হাতের বাইরে, দ্বিতীয়টা লোকসানের, কিন্তু তাতে পাড়ার লোকে দু'দশ কথা শোনাবার সুযোগ পায় না। ঘরে রেখে একটা কাজে-কর্মে ঢুকিয়ে দিতে পারলে তবু হয়। কর্তা-গিন্নী অনেক পরামর্শ করলো।

গিন্নী বলল, 'ওর বরং একটা বিয়ে দিয়ে দাও।'

'হ্যাঁ, এই না হ'লে আর মেয়ে-বুদ্ধি! একটার পিণ্ডি জুটছে না, আবার আর একটা।'

'বৌ-ই তখন ঘাড়ে ধরে চাকরি করাবে, চাপে না পড়লে পুরুষমানুষ কিছু করে? বৌ এলে গেরস্থর কাজ করবারও একটা লোক পাওয়া যাবে, আমি তো আর খেটে খেটে পারি না।'

'না পারো, বাপের বাড়ী যাও। ওসব হবে না, শেষে দুটো মানুষ ঘাড়ে চাপবে।'

'বৌ তো হবে খুব কচি, তাকে না-হয় এখন বাপের বাড়ী রেখে দেবে, তারপর যার বৌ সে বুঝবে।'

'তাতে লাভটা হ'ল কী?'

'লাভ আছে। সেটুকু বোঝার বুদ্ধি তোমার ঘটে নেই। শোন, এদিকে এস।' চাপা গলায় বলল গিন্নী, 'পণের টাকাটা হাতিয়ে নাও না। লোকের মুখেও চাপা পড়বে, টাকাটাও আসবে।'

'টাকা। হুঁ, এটা অবশ্য মন্দ কথা নয়। তবে একটু ভেবে দেখতে দাও।'

মামা ভেবে দেখল, এবং বুঝল যে মেয়ে-বুদ্ধি শুধু প্রলয়ংকরী নয়, সময় সময় অর্থংকরীও।

বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। খাল পেরিয়ে আরও আট-দশ মাইল গেলে বড়বিল গ্রাম। সেখানকার মেয়ে। মামা ইচ্ছে করেই একটু দূরে গিয়েছে, যাতে মেয়েপক্ষ ছেলের বারমুখো মনের নানা ব্যাখ্যান না শোনে।

একই মাত্র মেয়ে দলু সরকারের—যতদূর সম্ভব টাকাকড়ি দেবে। এবং সেটা যে মামাই গাপ করবে তা গোলাপ জানত। বিয়ে দিয়ে মামা জিতে যাবে, তা সে সহ্য করতে পারবে না। আড়াআড়ির ভাবটা তীক্ষ্ণ একটা প্রতিশোধস্পৃহার মতো মনের মধ্যে শানিয়ে উঠল। কি করা যায়? পালাবে? হ্যাঁ, পালাবে। কিন্তু এখন নয়। এখন পালালে মামাকে শুধু টাকাটা ফস্কাতে হবে। আরও বাদে পালাবে। বিয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে। তাহ'লে অপদস্থ অপমানের চূড়ান্ত হবে মামা লোকজনের কাছে, চাই কি, দু'চারখানা লাঠিও ভেঙে যেতে পারে মামার পিঠে। টাকাও ফস্কাবে, বেইজ্জত-ও হবে। খুশী হ'ল গোলাপ—চমৎকার ফন্দি এসেছে মাথায়।

বরযাত্রীসহ বর গেল বড়বিল গ্রামে। কন্যা-সম্প্রদান হ'ল। বর সভাস্থ করার সময় কিছু টাকা দিয়েছে মেয়ের বাপ দলু সরকার। বাকী

টাকাটা দেবে পরে। এখনও পালাতে পারলে মামাকে কিছুটা অপদস্থ করা যায়, বাকী টাকাটাকেও অনিশ্চিত ক'রে তোলা যায়।

বাসর-ঘর। মেয়েরা কোলাহল শেষ ক'রে চলে গিয়েছে। গোলাপ দরজাটা ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

হেরে যাচ্ছে সে মামার কাছে। যত হারছে, ততই তার রাগ বাড়ছে। তেরো-চোদ্দ বছরের বৌটা খাটের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখেও তার মেজাজ চড়ে গেল। এ মেয়েটাও মামার সঙ্গে যোগ দিয়ে গোলাপকে জব্দ করবার চেষ্টায় আছে।

কচি বৌটার সামনে এসে গোলাপ বলল, 'নাও, শুয়ে পড়, ঘুমোও।'

বিমলি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।

গোলাপ ঘরের মেঝেতে হারিকেনটা নিয়ে বসল। তার কাছে পার্ট-লেখা কাগজ ছিল, তাই চুপচাপ মুখস্থ সুরু ক'রে দিল।

বিমলি ড্যাবড্যাব ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গোলাপের পার্ট মুখস্থর হয়তো দরকার ছিল না, কিন্তু জেগে থাকাটা দরকার, আজ রাতেই সে পালাতে চায়। নিজের গাঁয়ে গিয়ে পালালে, মামা অপদস্থও তেমন হবে না, আর ইতিমধ্যে টাকাটাও আদায় হ'য়ে যেতে পারে। আর আজ রাতে বর পলাতক হ'লে, কাল সকালের এত লোকজনের মধ্যে বরকর্তার অসহায় মুখটা কল্পনা করেও গোলাপের একটা আনন্দ হ'ল।

মেয়েটা এখন তাড়াতাড়ি ঘুমোলে হয়। খাটের দিকে চেয়ে ত্যাখে, মেয়েটা ড্যাবড্যাব ক'রে তাকিয়ে আছে—আশ্চর্য হ'য়ে বোধহয় সব ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

উঠে খাটের কাছে এল গোলাপ: 'ঘুমোও শিগ্‌গির।' ধমক দিল গোলাপ। 'চোখ খুলে কি হচ্ছে, অ্যাঁ? চোখ খুলে লোকে ঘুমোয় নাকি? চোখ বোজো শীগ গির।'

মেয়েটি ভয় পেয়ে তক্ষুনি চোখ বুজল। কিন্তু একটু বাদেই মিটমিট ক'রে তাকাল।

গোলাপ খাটের পাশে দাঁড়িয়েই ছিল, দেখছিল বিমলির চোখটা, মুখটাও।

'অ্যায়, আবার চোখ খুলছে!'

ধমক শুনে মেয়েটা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল, 'আমার ভয় করছে।'

'ভয়? কিসের ভয়? ভূতের না ডাকাতের?' গোলাপের একটু সম্বিৎ

ফিরে এল—এত জোর-জবরদস্তি করলে মেয়েটা হয়তো সারারাতে ঘুমোবেই না, বরং একটু ভালো ব্যবহার করা দরকার।

গলাটা গোলাপ মোলায়েম ক'রে ফেলে : 'না, না, ভয় কি, আমি তো রয়েছি। ভয় নেই, ঘুমোও।'

গোলাপ খাটে বসল বিম্‌লির পাশে, তাকে ভরসা দিতে। মেয়েটা চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে রইল গোলাপ। হঠাৎ তার মনে পড়ল ইন্দু-বিন্দুর কথা। বরযাত্রী আসবার জন্যে ওরা কান্নাকাটি করেছিল। পথের দূরত্ব ও অসুবিধার কথা ভেবে ওদের আনা হয়নি।

বিম্‌লি মোটেই ইন্দু-বিন্দুর মতো দেখতে নয়। ইন্দু-বিন্দু ফরসা, বিম্‌লির রং শ্যামলা। ওদের গড়ন একটু হালকা ধরনের, আর বিম্‌লি বেশ স্বাস্থ্যবতী।

বিম্‌লিকে এইমাত্র যে ভরসাটুকু দিল, সে-কণ্ঠস্বরটা যেন ইন্দু-বিন্দুকে সান্ত্বনা দেওয়ারই স্বর।

না, তবু কোথায় যেন পার্থক্য আছে। অনেকটা পার্থক্য।

চোখ-বোজা মেয়েটা অন্য কথা ভাবছিল। সে এক মেয়ে—বাপের আদুরে। বাবার ঘরেই শোয় সে। একা শুলে ঘুম আসে না—ভয়-ভয় লাগে। ঘুমের মধ্যেও বাবার উপস্থিতির নিশ্চিন্ত আশ্রয়কে সে অনুভব করে। সারাদিনের নানা ধকলের পর ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল, কিন্তু ঘুমোলে সে একা হয়ে যাবে না তো? স্বামী নামক লোকটা তো কেমন যেন—বাবার মতো নয় মোটেই। লোকটা ঘরে থাকবে তো? না থাকলে কিন্তু তার ভয় করবে—ঘুমের মধ্যেও ভয় করবে। ঘুমটা এসেছে, কিন্তু একটু আশ্বাস না পেলে বিম্‌লি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে না। লোকটা বোধহয় এখনও খাটের ওপর বসে আছে—নামবার মতো আওয়াজ বিম্‌লি পায়নি। তবু লোকটা এমন চড়া গলায় কথা বলে যে, পুরো ভরসা রাখা দুষ্কর। চোখ খুলল বিম্‌লি।

গোলাপ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখ খোলা দেখেই তার ধমক দেবার কথা, কিন্তু চোখাচোখির গুণে একটু সংকুচিত হ'ল গোলাপ—ঘুমন্ত মেয়েটার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকাটা উচিত হয়নি। একটু অপ্রস্তুতভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'কি?' একটু থেমে যোগ করল, 'জল খাবে?'

বিম্‌লি ঘাড় নাড়ল : 'না।'

'তবে?'

মিষ্টি গলাতেই তো কথা বলছে লোকটা, ভালো লাগল বিম্‌লির, ভরসাও গেল একটু ; জিজ্ঞেস করল, 'আমি ঘুমোলে তুমি চলে যাবে না ?'

ধক্‌ ক'রে উঠল গোলাপের বুকটা। মেয়েটা কি তার গোপন অভিসন্ধি জেনে ফেলেছে নাকি ?

'—তাহ'লে আমার বড় ভয় করবে।'

তবু ভালো। গোলাপ অনাবশ্যক ব্যস্ততায় তাকে ভরসা দিল : 'না, না, এই রাতে কোথায় যাব ? তাকে আশ্বস্ত করবার আগ্রহে তার হাতটা ধরল : 'ভয় নেই তোমার। ঘুমোও।'

হাত দুটো ছোঁয়াছুঁয়ি হ'তেই দুটো দেহে এক আশ্চর্য শিহরণ জাগল। বিম্‌লির আসন্ন ঘুমটা একটু থমকে দাঁড়াল। দূরাগত কোন এক অপরিচিত গানের স্বর আরো একটু ভালো করে শুনবার জন্যে যেন সে কান পেতে রইল। হঠাৎ একটা বড় মাপের ঢেউ ছুঁয়ে গেছে তীরের সেই জায়গাটা, যেখানে জল এসে পৌছোয়নি এতদিন।

আচ্ছন্নতা একটু কেটে গেলে বিম্‌লি ভাবল, হাতটা বাবার মতো নয়। লোকটাকে যত ভয়ানক আগে মনে হয়েছিল, তত ভয়ানক নয়। বাবার মতো অত ভালো নয় অবশ্য, তবু খুশী হ'ল বিম্‌লি। আগের ধমকের সুরে কথা ব'লে ভয় পাইয়ে দেবে না কথা দিলে, বিম্‌লি স্বামী লোকটার সঙ্গে আরো দু'একটা কথা বলতে পারে এখন।

গোলাপ ভাবছিল, হাতটা মোটেই ইন্দু-বিন্দুর মতো নয়। তাদের হাত সে কত ধরেছে, কিন্তু এমনটা কোনদিন হয়নি। এ একেবারে নতুন, আলাদা। মেয়েটা ততটা মামার দলে বোধহয় নয়।

গোলাপ বলল, মোলায়েম গলাতেই বলল, 'ঘুমোও।'

বিম্‌লি, ভয়ে নয়, খুশীতে, নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় চোখ বুজল।....

বিম্‌লি একটু বাদে চোখ খুলল।

গোলাপ জিজ্ঞেস করল, 'কি ?'

'তুমি বুঝি রাতে ঘুমোও না ?' একটু ইতস্তত ক'রে বলল বিম্‌লি।

'না।'

কথা বলতে বেশ ভালোই লাগছিল গোলাপের, তবু ছোট্ট 'না' দিয়ে প্রসঙ্গটা শেষ করল।

'চোখ চেয়ে আছো কেন ?' বলল গোলাপ।

কথাটা গায়ে না মেখেই বিম্‌লি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাতে যাত্রা করো ?'

'হ্যাঁ।'

গোলাপের হ'ল মুশকিল। মেয়েটা জেগে আছে ব'লে, রাগ হচ্ছে, আবার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগছে।

একটু বাদে যেন অনুনয়ের সুরেই বিম্‌লি বলল, 'আমায় একদিন শোনাবে?'

ইন্দু-বিন্দুর সহস্র প্রশস্তিতেও নিজেকে এত বড় মনে হয়নি গোলাপের, এত খুশী হয়নি সে। বলল, 'শোনাব, নিশ্চয়ই।'

'এখন?'

'না।'

'তবে?'

'পরে।'

'কাল?'

থমকে গেল গোলাপ। কাল? কাল সে যে অনেক দূরে থাকবে। বলল, 'আচ্ছা, কাল।'

'কাল যে কালরাত্তির।' মনে পড়ল বিম্‌লির।

গোলাপ বলল, 'আচ্ছা, তাহ'লে পরশু।'

'আচ্ছা।' ফিকে আলোর মত একটা প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ল মেয়েটির সারা মুখে।

দুজনেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ জেগে উঠল গোলাপ। উৎকণ্ঠায় বেশীক্ষণ ঘুম হয়নি। তখনও বেশ রাত আছে।

বিম্‌লি অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেমানুষের মতো। কাপড়-চোপড় একটু বিস্রস্ত।

তার দিকে চোখ পড়তেই একটা মৃদু শিহরণ অনুভব করল গোলাপ। কাছে এগিয়ে এসে বিম্‌লির মুখটা সে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগল। তার বুকের মধ্যেকার পুরুষটা জাগছিল। তার মুখটা ধীরে ধীরে বিম্‌লির মুখের ওপর নামিয়ে আনবার একটা আকাঙ্ক্ষা যেন তাকে ভেতর থেকে ঠেলতে লাগল। একটু কাছাকাছি এলোও সে। ঘুমন্ত মেয়েটার গভীর নিশ্বাস গোলাপকে ছুঁয়ে গেল। হাতটা একটু কাঁপছে। বুকটা ঢিপঢিপ করতে সুরু করেছে। না, মেয়েটা জেগে উঠবে। তাহ'লে গোলাপের আর যাওয়া হবে না। মামাকে হারাবার, প্রতিশোধ নেবার আজ রাত্রেই শেষ সুযোগ।

চোরের মতো নিঃশব্দে গোলাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর ফিরল না সে। কল্পনার চোখে দেখল মামার লাঞ্ছিত মূর্তি, বিজয়ের তীব্র মাদক-রসের আস্বাদন ছিল তাতে। বাড়ী ফিরলে মামার পরাজয়ের ভাগটা কমে যায়। টাকার শোক পাক মামা, পাক লোকের গঞ্জনা। যতবার যত লোক অভাগিনী মেয়েটার দিকে তাকাবে ততবার মামাকে তারা অভিসম্পাত দেবে। দু'-একটুকরা অভিশাপ অবশ্য গোলাপের উদ্দেশ্যেও বর্ষিত হবে, কিন্তু অত দূরের অভিশাপ তাকে স্পর্শ করবে না।

তা ছাড়া, মামাবাড়ীর আকর্ষণও তার কমে গিয়েছিল। অনেকদিন ধরেই বাইরের টান তার বাড়ছিল। অনেক আলোয় হাজার লোকের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে নতুন সাজপোশাকের মধ্যে নতুন মানুষ হিসাবে সজীব হ'য়ে ওঠার নেশা তার রক্তে মিশে গিয়েছিল। তার কাছে তুচ্ছ পূর্ণর প্রশংসা, ইন্দু-বিন্দুর স্তুতি, এক-রাত্রির-দেখা মেয়েটার মোহ। পালাবার পর বেশ কয়েকদিন একটা মধুর আবেশ ছিল সেই রাত্তিরটার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে তো বাড়ী ফেরবার কথা ভাবতেই পারল না। অনেকদিন পরে যখন বাড়ী ফেরার কথাটা ভালো ক'রে ভেবে দেখল, তখন সে-আবেশ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। বাড়ী ফেরার কোন আগ্রহ সে অনুভব করল না। এবার মামাকে জব্দ ক'রে না এলেও সে আর ফিরত কিনা সন্দেহ। মনের দিক থেকে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার দিক থেকে সে বাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলই, ঠিক এমন সময়ে মামা ভুল ক'রে বিয়েটা দিয়ে বসল। বেশিদিন বিম্‌লির সঙ্গে থাকলে হয়তো সেদিকে একটা নতুন আকর্ষণ সে অনুভব করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। এ বিয়েটারও কোন গুরুত্ব ছিল না তার কাছে, সে স্বীকারই করত না এটাকে বিয়ে বলে, মামাকে জব্দ করবার একটা কৌশল মাত্র। যত সে দেরী ক'রে ফিরবে, মামা তত বেশী জব্দ হবে। অতএব দেরী করা যাক। দেরী করতে করতে বাড়ী ফেরার ইচ্ছে তার মনের মধ্যে মরে গেল, বাড়ীর স্মৃতি এলো ঝাপসা হ'য়ে। এদিকে নতুন পেশা নবীন মনে উন্মাদনার আগুন জেলে রেখেছিল, অন্য কোন দিকে বিশেষভাবে তাকাবার অবসর ছিল না তার।

সাত-আট বছর কেটে গেল। অতীতের জীবনটা প্রায় মুছে গেল তার মন থেকে।

এমন সময় সাগরের সঙ্গে দেখা। সাগরকে কেন্দ্র ক'রে অতীতটা ভেসে

উঠল। আবছা সেই মেয়েটা সাগরের পথ আটকে দাঁড়াল। মৃত অতীতটা জীবন্ত বর্তমানকে হারিয়ে দিতে চাইল। না থাক হৃদয়ের স্বীকৃতি, সামাজিক স্বাক্ষর যে প্রথমটির ওপর মন্ত্রের খোদাইয়ে চিহ্নিত।

কলকাতায় এসে গোলাপ সব কথাই খুলে বলল বসন্তকে।

'তাহ'লে ?' হতাশ ভঙ্গিতে বলল বসন্ত। এত জটিল একটা ব্যাপারের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। গোলাপ সব খুলে বলেছে, সাগরী-গোলাপকে পারুল যে বন্দী ক'রে রেখেছিল, সেই বন্দীদশার ঘটনাও উল্লেখ করতে ভোলেনি। বসন্ত বন্ধুর যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু পথ কোথায় ?

কয়েকদিন বাদে বসন্ত বলল, 'চল্, বরং তোর দেশ থেকে ঘুরে আসি। তোর বৌর খোঁজ করা যাক।'

গোলাপের এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই। আশঙ্কা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

দু'একবার ভাবল, মৃত অতীতটাকে পুরো অস্বীকার ক'রে সাগরীকে বিবাহ ক'রে ফেলা যাক। কিন্তু তাতেও ভয় হয়—ভবিষ্যতে কোনদিন যদি অতীতটা হঠাৎ জেগে ওঠে, সাগরীকে সে মুখ দেখাতে পারবে না। তা ছাড়া, বসন্ত জেনেছে সব, বিবাহ সে ঘটতে দেবে না। সুতরাং মনের যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ?

কিছুদিন গড়িমসি ক'রে কাটাল গোলাপ—বসন্তের প্রস্তাবটা এড়িয়ে। তারপর একদিন সে রাজী হ'ল। এই অনিশ্চয়তা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। যাহোক একটা মীমাংসা হ'য়ে যাক।

দু'বন্ধুতে এল মামাবাড়ীর দেশে।

মামাবাড়ীতে কেউ নেই। বাড়ীটার জীর্ণ দশা। গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করা গেল। দেশ-বিভাগ হওয়ার ফলে ভাঙা অবস্থা গ্রামটার। অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে।

মামা-মামী দুজনেই মারা গেছে। পূর্ণ একটা চাকরী নিয়ে উত্তরবঙ্গে কোথায় যেন চলে গেছে। কেউ বলল—দিনাজপুরে, কেউ বলল—রংপুরে ; কেউ বলল—দিনাজপুরেই প্রথমে গিয়েছিল, তার পরে অন্য চাকরী নিয়ে বগুড়া চলে গেছে। বোনদের এখানে রেখে যাওয়া মুশকিল—ঘরে পুরুষ নেই, পূর্ণ তিন বোনকেই সঙ্গে নিয়ে গেছে। জমি-জমা সব মধ্যে একবার এসে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। অর্থাৎ এখানকার পাট সে একেবারেই তুলে দিয়েছে।

মামা-মামীর মৃত্যুর কিছুদিন বাদে দলু সরকারেরও মৃত্যু হয়। মামা ও

দলু সরকারের সম্পর্ক ভালো ছিল না—গোলাপের পলায়ন ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার তার কারণ। দলু বেঁচে থাকা পর্যন্ত বিম্‌লি বাবার কাছে ছিল। দলুর মৃত্যুর পর তার অবস্থা অসহায় হ'য়ে দাঁড়াল; সে এক মেয়ে, বাড়ীতে পুরুষ নেই, মেয়ে বলতেও ছিল দূর-সম্পর্কের বৃদ্ধা মাসী। এই অসহায় অবস্থাটা কল্পনা ক'রে দলু মৃত্যুর আগের দিনগুলোতে বড় কষ্ট পেয়েছে; তার ইচ্ছে ছিল, জামাইকে তার বাড়ী-জমি দিয়ে এখানেই বসিয়ে যায়; বন্ধনহীন বাপ-মা-মরা গোলাপকে তার সেইজন্যেই পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু বিধি বাদ সেধেছেন।

শেষে গোলাপ যখন ফিরলই না, এবং দলুও বুঝল যে তার শেষদিন অতি কাছে, তখন সব জমি-জমা বিক্রি ক'রে কিছু নগদ টাকা আর গয়না মেয়ের হাতে রাখলো। আর পূর্ণকে ডেকে বলল, 'আমার মৃত্যুর পর বিম্‌লিকে তোমরা দেখো। হাজার হোক, ও তোমাদের ঘরেরই বৌ। গোলাপ যদি কোনদিন ফিরে আসে, তবে তোমাদের কাছেই আসবে। বিম্‌লি থাক্ তোমাদের কাছে।'

আপত্তি করেনি পূর্ণ। গোলাপের বৌ ব'লে বিম্‌লির ওপর তার একটা মমতা ছিল। দলু সরকারের সঙ্গে যখন তার বাবার তিক্ত বৈরী-সম্পর্ক, তখনও সে বিম্‌লি সম্পর্কে একটা করুণ স্নেহ পোষণ করে এসেছে। তা ছাড়া, বিম্‌লির কিছু টাকা আছে, একেবারে গলগ্রহ নয়, তবে খুব দরকার না হ'লে বিম্‌লির টাকায় সে হাত দেবে না। গোলাপ যদি না ফেরে, তবে ঐ টাকাটাই বিম্‌লির একমাত্র সম্বল।

পূর্ণর বাড়ীতে বিম্‌লির অনাদর হয়নি।

পূর্ণদের সঙ্গে বিম্‌লি চলে গেছে উত্তরবঙ্গে—দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া অথবা অন্য কোথাও।

সব খবর শুনে বসন্ত ও গোলাপ পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। অর্থাৎ এখন কী কর্তব্য?

উত্তরবঙ্গ ঘুরে বসন্ত আর গোলাপ ফিরে চলে এল কোলকাতায়। দুজনের কেউ কোন সিদ্ধান্ত করতে পারল না।

শেষে একদিন বসন্ত বলল, 'তুই সাগরকে বিয়ে ক'রে ফেল্।'

'তারপরে?'

'বিম্‌লির খোঁজ হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না। অনর্থক তোদের দুজনকে—'

'যদি হঠাৎ বিম্‌লি একদিন এসে পড়ে ?'

'নাঃ, মনে হয় না।'

'কোনদিন কিছু হ'লে তুই দায়ী।'

'আচ্ছা।' হাসল বসন্ত।

বসন্তর প্রস্তাবটা গোলাপেরও মনের কথা। কিন্তু সে মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। বিবেকের দংশন এখন ততটা তীব্র হবে না—সে তার সাধ্যমতো বিম্‌লি সম্পর্কে খোঁজখবর করেছে।

'তবে একটা কথা দিতে হবে, বসন্ত।'

'কি ?'

'এই বিম্‌লির ব্যাপারটা কোনদিন সাগরকে বলতে পারবি না।'

'তুই কি খেপেছিস ! আমি যাব সাগরকে এই কথা বলতে ?'

বসন্ত চিঠি লিখল তার মেসোমশাইর কাছে : 'পাত্র পাওয়া গেছে ; সুপাত্র এবং চেনা ; গোলাপ।'

বিয়ে হ'য়ে গেল। কথা রেখেছে বসন্ত। বিম্‌লির কথা সাগরীকে বলেনি কেউ। গোলাপও নয়। সাগরী আজো কিছু জানে না—বিম্‌লির নামটুকু পর্যন্ত নয়।

সাগরী বিয়ের অল্প পরের চিঠি খুলল একখানা : '...এখন বাইরে বেরোতে ভালো লাগে না তেমন। তোমায় একা ফেলে এসেছি মনে করতেই কষ্ট হয়। যদি একটা নট্‌-নড়ন-চড়ন চাকরি পেতুম তো বেশ হ'ত। তা আর কে দিচ্ছে বল তোমার এই মুখ্যু স্বামীটাকে। যাকৃগে, এসব বাজে কথা। তুমি কেমন আছো ? তোমার একা থাকতে কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু কি করি বলো তো ! তবু ভাগ্যিস ভালো একটা বাড়ী পেয়েছি, যে-বাড়ীতে ভবন-দাদুর মতো লোক রয়েছেন। তাইতো তবু বেরোতে পারছি, নইলে কী অসুবিধে হ'ত একবার ভাবো দেখি ? তোমায় একলা কোথায় রেখে আসতুম ! ভবন-দাদু আমার পেশা দেখে আমায় ছোটলোক ভাবেননি। অনেকে তা ভেবেছে। ভবন-দাদু ছাড়া আর একটা লোক ভাবেনি, বরং ভালবেসেছে, আমি যা নই তার চেয়ে আমায় অনেক বড় ক'রে ভেবেছে। সেই লোকটার কথা ভাবলে মনে হয়, ভগবান আমার ভাগ্যে অনেক ভালোও দিয়েছেন। দুঃখ হয়, আমিই বরং তার কিছু আদর করতে পারলুম না। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, সেই লোকটা

কে। বল তো, কে? না মশাই, আমি কিছুতেই বলব না। বললে হয়তো সে-মহারাণীর মাটিতে আর পা-ই পড়বে না।…'

চিঠি পড়ায় বাধা পড়ল। ঘরের দরজাটায় ধাক্কা দিচ্ছে ছোটবৌ: 'কি গো সাগর-রাণী, আর কত ঘুমোবে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যার স্বপ্ন দেখছো, তার চিঠি এসেছে।'

তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো লুকিয়ে ফেলল সাগরী; এ তার অতি-গোপন ধন—এতে ছোটবৌরও কোন অংশ নেই। দরজাটা খুলল সাগরী।

'উঃ বাবা, কী ঘুম! তুমি যদি যাত্রাদলে পার্ট কর, কিছুতেই তোমাকে রাণীর পার্ট দেবে না, দেবে কুম্ভকর্ণের পার্ট।'

সাগরী হেসে বলল, 'ঐতেই আমার হবে।'

ছোটবৌ বিস্ময়ের ভান করল: 'রাজার বৌ কুম্ভকর্ণ! কী সর্বনাশ! ও কি বলে জান? গোলাপবাবু সারা রাত জেগে যাত্রা করেন, আর তাঁর স্ত্রী সারা দিনরাত ঘুমিয়ে কাটান, গড়পড়তা ঠিক আছে।' থামটা দেখিয়ে বলল, 'এর মধ্যে কী আছে বল তো?'

সাগরী হেসে বলল, 'তোমার মুণ্ডু।'

'না গো, তোমার পরাণ।'

'আমার অনেকদিন বিয়ে হয়েছে, ছোটবৌ—তিন ছেলেমেয়ের মা। নিজেকে দিয়ে সবাইকে যাচাই করো না।'

'ওগো থুড়থুড়ী বুড়ী ঠানদি, নিজেকে দিয়ে যাচাই করব কি ক'রে? এ হতভাগী কি কোনদিন একখানা চিঠি পেয়েছে? এখানে তো দুজনে নিত্যি একঘরে। বাপের বাড়ী গেলে, রোজ বিকেলে অফিস ফেরার পথে ও গিয়ে হাজির হয়, চিঠি লেখার ফুরসত কোথায়। জীবনে একখানা চিঠি পেলুম না, জানব কি ক'রে চিঠি পেলে কেমন লাগে। তুমি কিন্তু ভাই বেশ আছো—কত চিঠি পাও তুমি।'

সাগরী করুণ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তা বেশ আছি।'

'নাও।' চিঠিটা সাগরীর হাতে দিল। 'এখন তো আমায় শত্রু মনে হচ্ছে? এখানে এখনও দাঁড়িয়ে আছি ব'লে তো শাপমন্যি করছ। তা বাপু, যাচ্ছি, মুখ ফুটে বললেই হয়। থুড়থুড়ী বুড়ী ব'লে অহংকার আছে, এদিকে চিঠিখানা খোলার বেলায় নতুন-বৌ, কেউ থাকবে না কাছে।'

চিঠি। পুরানো নয়। নবতম। গোপাল লিখেছে: …বহরমপুরে এসেছি। এখানে যে-গাওনার জন্যে আমরা এসেছি, তা ছাড়াও নতুন

বায়না হয়েছে। এখানে বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে মনে হচ্ছে। লালগোলায় তোমাদের বাড়ীতে যেতে পারিনি এখনও। শীগ্‌গিরই একফাঁকে যাব। ···একটা ছেলের অসুখ নিয়ে আট্‌কে পড়েছিলাম, নইলে বহরমপুরে আসবার আগেই যেতাম। জানো সাগর, ছেলেটার শিয়রে বসে খালি খোকনের কথা মনে হচ্ছিল।···

বহরমপুরে প্রথম পালা এক বড়লোকের বাড়ীতে। তাদের বংশের একমাত্র ছেলের ভাত—খুব ধুমধাম। পালাটা কেষ্টঠাকুরের হ'লে ভালো হয়।

এ পালাটা দাসমশাইর পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। এটা কলকাতা থেকে ঠিক ছিল না। এ তল্লাটে আসবার পর ঠিক হয়েছে। এমনই হয়, এক জায়গার লোকের ভালো লাগল তো, আর এক জায়গায় ডাকল—এক খেপে হ'লে উদ্যোক্তাদের টাকা লাগে কম, যাত্রাদলেরও সুবিধে—নইলে এক-আধ পালার জন্য এত খরচ ক'রে আসা যায় না।

আসলে কথা ছিল এখানকার দোকানদারদের সঙ্গে—দু'পালা গাওনা হবে।

আর এই মোট তিন পালা যদি খুব পছন্দসই হয় তবে বাসন-ব্যবসায়ীরা ডাকতে পারে। এদের সঙ্গে খুচরো দোকানদারদের একটা সুক্ষ্ম রেষারেষি আছে। এরা নিজেদের একটু বড় ভাবে—অবশ্য কারবার এদের খুচরো দোকানদারদের চেয়ে বড় তাতে সন্দেহ নেই। দোকান-দাররা যখন যে অনুষ্ঠান করবে, এরা তার চেয়ে বড় কিছু করবে। জাঁকজমক, টাকা-খরচা, আর দিনের সংখ্যা বাড়ানো হয়। এরা অধিকারীকে বলে গেছে, গাওনা পছন্দ হ'লে তিন রাত্তিরের ব্যবস্থা করবে তারা—দোকানদারদের দু'পালার চেয়ে বেশী হ'ল। আর তিন পালাই নতুন করতে হবে, অর্থাৎ আগেরগুলোর পুনরাবৃত্তি চলবে না।

দাসমশাই এই কাজটাকে ধরবার জন্য উৎসাহের সঙ্গে সবাইকে তালিম দিয়েছে, বাপান্ত ও মারধর করছে, সাজ-পোষাক মেরামত করিয়েছে, বাসন-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথার মারপ্যাঁচ কষেছে, অধিকারীর কর্তব্যে ত্রুটি নেই।

পয়লা পালাটা চমৎকার হ'ল। সেই বড়লোকদের বাড়ীতে কেষ্টঠাকুরের পালা।

বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ বৃহত্তর কর্তব্যের জন্যে চলে যাচ্ছেন। রাধার সখীদের গান কান্না হয়ে ঝরে পড়ল। কিন্তু কৃষ্ণ যে মিনতি রাখতে পারেন না। সখীরা স্মরণ করিয়ে দিল, বৃন্দাবনের প্রতিটি ধূলিকণার মধুর স্মৃতি, রাধাপ্রেমে অনুরঞ্জিত অসংখ্য মুহূর্ত। কৃষ্ণের প্রতি পদক্ষেপে বাধা পড়ে, হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে কে যেন পিছুটান দেয়। তবু যেতে যে হবেই। সখীরা অনুনয় করে, আবার যেন তাহলে ফিরে এসো, শ্যাম। আমরা তোমার পথ চেয়ে থাকবো! তোমার রাধাকে যে তুমি কাঁদিয়ে গেলে, যমুনাও গ্রীষ্মের খরতাপে শুকিয়ে যাবে, রাধার চোখের জল আর আজ থেকে শুকোবে না একবারের জন্যেও, তুমি এসে রাধার চোখের জল মুছিয়ে দিও। লতাগুলো মুমূর্ষু বন্ধ্যা হয়ে পড়ে থাকবে, তুমি এসে তাদের ফুল ফুটিও। আবার ফিরে এসো আমাদের এই অঙ্গনে, যমুনাতীরে, গোচারণের প্রান্তরে, আমাদের জীবনে, আমাদের দেহমনে; বসন্ত-বাতাসের স্পর্শের মতো তুমি আমাদের জাগিয়ে তুলো, আমাদের বহুদিনের বহু স্মৃতিকে তুমি সঙ্গীতের সুরে মুখর করে দিও, আমাদের কাঁদিয়ো, আমাদের হাসিয়ো, আমাদের বাঁচিয়ো!

তারপরে রাধাবিরহ—দুঃসহ দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আশানিরাশার দ্বন্দ্বে আর্ত হৃদয়—প্রতি পত্রশব্দে প্রিয়-পদ-ধ্বনির আশা। স্বপ্নের ব্যাখ্যায়, বাঁ চোখ কাঁপায় কত না আশঙ্কা!

দর্শকরাও রাধার চেয়ে কম কাঁদল না।

অধিকারী দাসমশাই হাসল। তার মনেও আশানিরাশার দ্বন্দ্ব—চতুর্থ দিনে দোকানদারদের যাত্রা সুরু। এই ক'দিন ভালো করে তালিম দিতে হবে ছোঁড়াগুলোকে।

পরদিন বেলা করেই উঠেছে গোলাপ। দাসমশাই এসে বলল, 'অ্যায় যে গোলাপবাবু, উটোচো, তোমায় একটি ঢ্যাঙাপনা লোক খুঁজচে, অনেকক্ষণ ধরে বসে আচে।

'কে?'

'বলচে তো তোমার মামাতো ভাই।'

'মামাতো ভাই?'

'হবে, এখন অনেক রকমের সব ভাই হবে।' গোলাপের বিস্ময়টা লক্ষ্য করেই বলল দাসমশাই।

'মামাতো ভাই?' বিস্মিত স্বগত পুনরুক্তি গোলাপের।

'বুঝলে না, ছেলেবেলায় পড়নি, সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটেহয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। কাল যা অ্যাক্টো করেচো, এখন কত ভাই গজাবে দেখ। যাও, দেখে এসো।'

গোলাপ বেরোচ্ছিল, দাসমশাই বলল, 'লোকটাকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে আর দু'এক পালার ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখো।'

'কোথায় ?'

'সে যেখানেই হোক। যমদূত আর আমরা—যেখানে ডাক পড়বে সেখানেই যাব বাবা—যাতায়াত আর খাইখরচটা দিলেই হ'ল, এ রাবণের গুষ্টির তাও তো নেহাত কম নয়।—ওরে শালা নটবর, এ তরোয়ালটা এখেনে পড়ে কেন। তরোয়াল কি মাগ্‌না আসে ? খেলা পেয়েচো ? বাপের সম্পত্তি শালা তোর ? জুতিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দোব—'

গোলাপ বাইরে এসে ছ্যাখে, রোগামতো ঢ্যাঙা একটা লোক, প্রায় তারই বয়সী।

'চিনতে পারিস ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

দাসমশাইর মুখে 'মামাতো ভাই' শোনার দরুন পূর্ণর কথা তার মনে হয়েছিল। লোকটার মুখের মধ্যে সে পূর্ণকে খুঁজতে লাগল। তেমন কিছুর সন্ধান পেল না। শুধু একটা কাটা দাগ ভুরুর ওপরে—গোলাপের সঙ্গেই ছেলেবেলায় মারামারি করতে গিয়ে কেটে গিয়েছিল। এখন একটু ফিকে হয়ে গেছে দাগটা তবু বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যায়।

'পূর্ণদা না ?'

'তবু ভালো, চিনতে পেরেছিস।' হাসল পূর্ণ। 'যেমন ক'রে চোখমুখ কুঁচকে তাকাচ্ছিলি !'

হঠাৎ গোলাপ অপরাধীর মতো সংকুচিত হয়ে গেল। তার চেতনাটা মুহূর্তের জন্য কি রকম ঝাপসা হ'য়ে এল। এখন কি করবে বা বলবে, ভেবে পেল না।

'আমি অবশ্য তোকে কালকে আসরে দেখেই চিনেছিলাম, মুখের আদলটা অনেকটা এক আছে, আর ছেলেবেলার মতো এখনও তুই একটু বাঁ দিকে ঝোঁক দিয়ে হাঁটিস, ঐ হাঁটা দেখলেই তোকে চেনা যায়। কাল তোদের খুব নাম হয়েছে।'

'হবেই তো। হবে না মানে ?' স্বয়ং দাসমশাই নটবরকে শাসন ক'রে

ফিরছিলেন। 'আলবৎ হবে। এ কি ঐ বংশী চাটুজ্যের অনার্য অপেরা? এ হল "বঙ্গ অপেরা"। অধিকারী—শ্রীহারাধন দাস।'

পূর্ণ মাথা নেড়ে একটু হেসে স্বীকার ক'রে নিল কথাটা: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বটেই তো।'

গোলাপ কাঠের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, আর মগজের মধ্যে একটা তোলপাড় চলছিল।

পূর্ণ বলল, 'চল্ গোলাপ—আমাদের বাড়ীতে। কাছেই, বেশী দূরে নয়।'

গোলাপ তোতলা হয়ে গেল: 'না, মানে, কাজ, হ্যাঁ, কাজ আছে, যাত্রার ব্যাপার—'

গোলাপের দুর্ভাগ্যক্রমে দাসমশাই তখনও বেশী দূরে নয়। দাসমশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'অ্যাঁ, কী কাজ? কিছু না। বাড়ীর মধ্যে তো দুটি—শ্বশুরবাড়ী আর মামার বাড়ী। তা মামার বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন এয়েচে, তখন—। আর এখেনে যা খাওয়াচ্চে মশাই, ছো ছো। দলে সব ভদ্দর লোকের ছেলে, এই সব বাজে জিনিস তারা বাপের জন্মে কোন কালে খেয়েচে না খেতে পারে, বলুন তো মশাই।'

দাসমশাই পূর্ণর সায় চায়।

গোলাপ দাসমশাইর বাগ্মিতায় ভয় পেয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ীর প্রসঙ্গ তো তুলে বসে আছে। এখন উৎসাহের আধিক্যে গোলাপের শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার জন্য ছুটি নেওয়ার প্রসঙ্গটা তুলে ফেললেই সর্বনাশ। এখন দাসের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়া দরকার।

গোলাপ তাড়াতাড়ি বলল 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল, ঘুরে আসি।'

'ঘুরে আসবি কেন? আজ না-হয় ওখানেই থাকবি। আজ তো আর কোন কাজ নেই।'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন।'

দাসমশাই বলল, 'আজ রাতে কাজ নেই, ঠিক কথা। তবে যদি কাজ-টাজ হয়, একটু দেখবেন মশাই। আপনি গোলাপবাবুর ভাই, আমাদের আপনজন, তাই বলচি। যদি কেউ যাত্রা-টাত্রা করাতে চায়, একটু খোঁজে থাকবেন, বলবেন আমাদের, এই আর কি। কাল আর কী দেখেচেন মশাই, ওর চেয়ে হাজারগুণে ভালো পালা আমাদের আচে।'

'আচ্ছা।' ঘাড় নাড়ল পূর্ণ। 'চল্, গোলাপ।'

'হ্যাঁ, চল্। এই—ইয়ে—ভাবছিলুম কি, আমার এক বন্ধুর—' দাসমশাইর

দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসন্তর সঙ্গে একটু বেরোব বলেছিলাম, ওর সঙ্গে একটু কাজ ছিল, কাজ মানে, কয়েকটা কথা—'

'তোর বন্ধুকেও নিয়ে চল্-না আমাদের বাড়ী।'

'তোদের বাড়ী?'

'হ্যাঁ। ক্ষতি কি? তোর তাঁর সঙ্গে কথা বলাও হবে, আমাদেরও তোর সঙ্গে কথা বলা হবে।'

'মন্দ নয়, বেশ বলেছিস, হ্যাঁ, তাই ভালো।' বসন্ত সঙ্গে থাকলে যেন একটু ভরসা পায় গোলাপ।

পূর্ণ জিজ্ঞেস করল, 'তুই হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'হাঁপাচ্ছি? হ্যাঁ, মানে খাটুনি তো কম নয়।' দাসের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই বলল, 'অবশ্য দাসমশাইর এখানেই তবু একটু কম, বাকী সব—! বসন্ত, এই বসন্ত?' চিৎকার ক'রে ডাকতে লাগল গোলাপ—তার সব কাজের মধ্যেই একটা অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখা যেতে লাগল।

দাস বলল, 'রোসো, আমিই ডেকে দিচ্চি।'

ভেতরে চলে গেল দাস।

পূর্ণর সামনে একা মুখোমুখি দাঁড়াতেও গোলাপের অস্বস্তি হ'তে লাগল।

একটু বাদে পূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলল, 'দিনকাল কত পাল্‌টে যায়! আমাদের বাড়ীতে যেতে, গোলাপ, তোরও আজ বাধো-বাধো ঠেকে। তোর যা রাগ, বাবা মারা যাবার পর আর তা পুষছিস কেন? আমাদের সঙ্গে তো তোর—'

'ও-কথা বলিস না, পূর্ণদা, মহাপাপ হবে আমার।' পূর্ণর হাতটা চেপে ধরল গোলাপ। পূর্ণর আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল সে। অতীতের একঝলক স্মৃতির আলো মনের মধ্যে সজীব হ'য়ে উঠল। 'পাপ আমার হয়েছে, তার ফলও আমি পেয়েছি, পাচ্ছি, আর বাড়াস না সে-পাপ। তোদের বাড়ী যাব না আমি, এ কী কথা বললি তুই। আমি যে তোদের অন্নেই মানুষ। অবুঝ বয়সে কখন কার ওপরে কী রাগ ছিল, সে-কথা তুলিস না আজ।'

পূর্ণও বুঝতে পারেনি যে এতটা নাড়া খাবে গোলাপ।

'সব খবর কি? এখানে তুই এসে পড়লি কি ক'রে? ইন্দু-বিন্দু কেমন আছে? সোনা?' একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করল গোলাপ।

'ইন্দু নেই।'

'অ্যাঁ ?'

'টাইফয়েডে মারা গেল। আমি অবিশ্যি সাধ্যমতো চেষ্টার কিছু বাদ দিইনি, কিন্তু বাঁচানো গেল না।'

ইন্দু মারা গেছে। গোলাপ সেই সপ্রশংস একজোড়া চোখ স্মরণ করতে চেষ্টা করল। এই ভাইবোনেরা তার কিশোর জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। এই মুহূর্তে ইন্দুর জন্যে সে কষ্ট পাচ্ছিল। এতদিনের ব্যবধান, ইন্দুর কথা বিশেষভাবে তাকে কোনদিন ভাবতে হয়নি, হয়তো ভুলেই যাচ্ছিল, এসব সত্ত্বেও এই মুহূর্তটি একটা বেদনা বহন ক'রে আনছে।

বসন্তকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

পথে পূর্ণ গোলাপের একটু-আগের প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছিল। পূর্ণ এখানে কালেক্টরী অফিসে নিম্ন কর্মচারী। আগে সত্যি সত্যিই উত্তরবঙ্গে কাজ করত—একাধিক জমিদারের সেরেস্তায়। তাই দেশের লোকের মুখেও একাধিক জায়গার নাম শোনা গেছে। ও-কাজে ভালো চলছিল না। তারপর হ'ল দেশভাগ। উত্তরবঙ্গের সেই অঞ্চল পড়ল পাকিস্তানে। এখানকার কালেক্টরীতে চাকরীর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে পূর্ণর এক শালা। হ্যাঁ, গোলাপকে পূর্ণ বলতে ভুলে গিয়েছে ; সে বিয়ে করেছে, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে।

গোলাপ উদ্বেগে কণ্টকিত হ'য়ে উঠল—এখুনি তার কথা কিছু না উঠে পড়ে। না, পূর্ণ অন্যপ্রসঙ্গে চলে গিয়েছে।

গোলাপের বিয়ের প্রসঙ্গটা মনে পড়েছিল পূর্ণর। কিন্তু কথাটা বসন্তর সামনে তোলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। বসন্ত ও গোলাপের সম্পর্কটা তখনও সে ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারেনি। তাই ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গান্তরে গেল। কথা বলতে ভালোই লাগছিল পূর্ণর। কতদিন পরে দেখা গোলাপের সঙ্গে। গোলাপের আবেগাভিভূত অবস্থাটা দেখেও আশ্বস্ত হয়েছিল—গোলাপ তাহ'লে ভুলে যায় নি তাদের।

গোলাপ কিন্তু এখন কিছুই শুনছিল না। পূর্ণর বাড়ীর দিকে যতই এগোচ্ছিল, ততই তার পা ভারী হ'য়ে আসছিল। ঝিমলি কোথায়—তার কী খবর ? প্রশ্নটা তার মনের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু পূর্ণকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

ভাড়া বাড়ী। ছোট্ট। পরিচ্ছন্ন। ঢুকে পূর্ণ হাঁক দিল : 'কই, সব এসো এদিকে।'

সবচেয়ে আগে এল পূর্ণর ছেলে ভণ্টু।

গোলাপের বুকটা ধক্ ক'রে উঠল। কেন যেন তার নিজের খোকনের কথা মনে পড়ল ভণ্টুকে দেখে।

পূর্ণর বৌ নিরুকে গোলাপের বেশ ভালো লাগলো। শ্যামলা রঙ, চোখে মমতাদৃষ্টি, মিষ্টি ব্যবহারে মুহূর্তে আপন ক'রে নিল গোলাপকে। প্রথমেই 'আপনি' সম্বোধনে আপত্তি করল; দেওর-ভাজের মধ্যে অত 'আজ্ঞে-আপনি' কেন!

'অমন পর-পর কেন ভাবছ ঠাকুরপো?'

'পর? না, না। কে বললে?'

'অমন জড়সড় কেন—যেন চোরের মতো।' হেসেই বলল নিরু।

'না না, জড়সড় কই?' একটা হালকা গা-ঝাড়া দিয়ে হাসবার চেষ্টা করল গোলাপ।

'এ বাড়ীতে লজ্জা-লজ্জা করলে বুঝবো, আমারই জন্যে। আমিই তো এক তোমার অচেনা—নতুন। আর তো সবাই পুরানো।'

গোলাপ প্রাণপণে সহজ হবার চেষ্টা করছে। রসিকতা করেই বলল, 'কিন্তু আমায় চোর বললে কেন?'

নিরু বাঁকা হেসে বলল; 'চোরের মতো চাউনি যে।'

গোলাপের দৃষ্টিটা এখন সত্যিই অস্বাভাবিক, আলুথালু। আর সেটা গোলাপও জানে। তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে চোখটা রগড়াল, হেসে সহজ হবার চেষ্টা করল।

'যা রাত-জাগার পেশা, চোখ সব সময়ই—। আর পুরানো বটে, তবে এত বছর বাদে সবই নতুন-নতুন লাগছে।'

একটা বয়স্কা মেয়ে এসে ঢিপ ক'রে গোলাপকে প্রণাম করল। ধড়াস ক'রে উঠল গোলাপের বুকটা।

নিরু বলল, 'বিন্দু।'

'ওঃ, কত বড় হয়ে গিয়েছে!'

বিন্দু জড়সড় হ'য়ে কাপড় টানাটানি ক'রে তার যথেষ্ট-ঢাকা দেহকে আরো ঢাকতে চেষ্টা করল। বিয়ের বয়স তার অনেককাল হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি, অথচ দেহটা এত অসভ্যের মতো বাড়ন্ত যে, এগারো হাত কাপড়ের শাসনটাকে পর্যন্ত মানে না। এতদিনের অদেখায় গোলাপদাই অচেনা হ'য়ে উঠেছে, তার ওপর সঙ্গে রয়েছে আর-একটি আনকোরা মানুষ।

সংকোচে দেহটাকে যথাসম্ভব কুঁকড়ে নিল। সরে গেল পাশে।

আর-একটি মেয়ে এসে সটান একবার গোলাপের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে চট ক'রে প্রণামটা সারল। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমায় আপনি চেনেন না, অবিশ্যি আমিও আপনাকে চিনি না, মানে দেখিনি, তবে খুব গল্প শুনেছি আপনার। আমি সোনা।'

গোলাপ ভালো ক'রে তাকাতে পারল না সোনার দিকে। বড় প্রখর। সেই সোনা! সবচেয়ে ছোট বোন। মার কাছে কাঁদলেও, তার কাছে এসে খিলখিল ক'রে হাসতো, মামী বলতো—'ছোঁড়া গুণ জানে।' না, সত্যি সে চেনে না সোনাকে। নতুন ক'রে এদের সব চিনতে হবে।

নিরু চাপা গলায় একটু যেন ধমকের সুরেই বলল, 'এই সোনা, থাম।' গোলাপের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কি ঠাকুরপো, দেখলে তো একালের সোনা। একালে সবেতেই ভেজাল। সোনাতেও। খাদ এত বেশী যে, গয়না গড়ানো যায় না, হয়তো বর্শা কি সড়কি তৈরী করা যায়।'

সোনা তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে ছিল নিরুর দিকে। বলল, 'থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল। দেখ না, গোলাপদাকে ব'লে-ক'য়ে যাত্রাদলে যদি ঢুকতে পারো, কুঁজীবুড়ী তোমায় চমৎকার মানাবে।'

নিরু সোনার কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে আর কথা বাড়াল না। বলল, 'বোসো ঠাকুরপো, জামা-কাপড় ছেড়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও।' বসন্তর উদ্দেশ্যে বলল, 'আসুন। আপনি তো ঠাকুরপোর বন্ধু, আমাদের পর ব'লে মনে করবেন না যেন।'

'পর মনে না ক'রে উপায় কি বলুন। এখানে আসবার জন্যে যখন বেরোই তখন তো কিছুই মনে করব না ভেবেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এখন মনে না ক'রে পারছি না।'

'কেন, কেন?'

'আমার বন্ধুটিকে তো কাল রাতের সেই ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণটি বানিয়ে চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বেচারা তো শ্রীদাম-সুদাম-সুবল পর্যন্ত হ'তে পারছি না, একেবারে শ্যামলী-ধবলী-মুঙ্গলী।'

হেসে উঠল সবাই বসন্তর বলার বিচিত্র ভঙ্গি দেখে।

সোনা বিন্দুর পিঠে একটা চড় মেরে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল: 'ও মেজদি, এ যে যাত্রাদলের মতো কথা বলে!'

বিন্দু চাপাগলায় গাল দিল, 'থাম্, মুখপুড়ী।'

বসন্ত নিরুকে বলল, 'তারপরে দেখুন বৌদি, আপনার খাদ-সোনা তার দাদাকেই তো ব'লে দিয়েছে, চেনে না, দাদার বন্ধু তো আরো অনেক দূর। আপনার বাড়ীর লোকদের আপন মনে করি কোন্ সাহসে?'

নিরু কিছু বলার আগেই সোনা বলল, 'বৌদি, পোড়াকপাল অমন চোখের! শুধু খাদটুকুই চোখে পড়ল, সোনাটুকু নয়? অবিশ্যি শ্যামলী-ধবলীর চোখে এর চেয়ে বেশী আর কি পড়বে?'

অল্প কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, বসন্ত কথাবার্তার কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে, গোলাপকে আড়াল করেছে খানিকটা। তবুও গোলাপ ঘামছিল।

হাসিতে-ঠাট্টায় কথায়-বার্তায় বসন্ত বেশ জমিয়ে তুলল। বয়স-বিড়ম্বিত বিন্দু পর্যন্ত নিঃশব্দে কয়েকবার হাসল, গাম্ভীর্যকে সরিয়ে অতিথির সঙ্গে দু'-একটা কথাও বলল। সোনা বসন্তর প্রতিটি কথার বিরুদ্ধতা ক'রে মাঝে-মাঝেই কথার যুদ্ধ চালাতে লাগল। বসন্তর কোন মজার কথায় হাসবে না প্রতিজ্ঞা করেও বেশ কয়েকবার তার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'ল এবং এ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য রাগও কম হ'ল না। নিরু প্রসন্ন হাসি হাসল।

বসন্ত ভণ্টুকেও বন্ধু ক'রে নিল। কোলে তুলে গাল টিপে বিচিত্র অর্থহীন শব্দে কথা বলল নিরুর কচি মেয়েটার সঙ্গে।

পূর্ণ আজ ছুটি নিয়েছে, অতিথিদের জন্যে বিশেষ বাজার করতে গেল।

বসন্ত ভেবে দেখল, বিম্‌লির কথাটা উঠে পড়বেই। এড়াবার কোন উপায় নেই। বরং নিজেই কথাটা তোলা ভালো। নিরুকে বলল, 'বৌদিকে—মানে গোলাপ-বৌদিকে তো দেখছি না। তিনি আপনাদের কাছেই ছিলেন—যতদূর শুনেছিলাম।'

বিম্‌লি রান্নাঘরে লুকিয়েছে। ইতিমধ্যে বিন্দু আর সোনা দু'-এক ফাঁকে গিয়ে বিম্‌লিকে টানাটানি করেছে আনবার জন্যে। বিম্‌লি আসেনি।

দুঃসাহসী বসন্তর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল গোলাপ।

বিন্দু বলল, 'আছে রান্নাঘরে। আসছে না।'

'আসছে না? কেন?'

সোনা বলল, 'যান. টেনে নিয়ে আসুন গে। অবিশ্যি আপনার গায়ের জোরে কুলোবে কিনা সন্দেহ—যা একখানা লাশ!'

বিন্দু তার যথেষ্ট-ঢাকা দেহটা আরো ভালো ক'রে ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল।

নিরু ধমক দিল, 'থাম্, সোনা।'

বসন্ত বলল, 'চলুন বৌদি, নিয়ে আসি।'

'এখন থাক্ ভাই। সময়ে হবে। তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই।'

এতদিন পরের দাম্পত্য সাক্ষাৎকার এই সরকারী জায়গায় হওয়া ভালো নয়, ভাবল নিরু। বসন্তও বুঝল কথাটা। তা ছাড়া বিম্‌লির খোঁজটা তো জানা গেল, এই মুহূর্তে সামনে না এলে ক্ষতি নেই কিছু, বরং লাভ আছে। গোলাপ একটু সামলে উঠুক। গোলাপের মুখটা ত্মাখো না, একেবারে ফ্যাকাশে, বলির পাঁটার মতো দৃষ্টি চোখে। আরে বাপু, অবস্থাটা তো বিগড়েছে, তা অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন, লোকে যে এতে আরো বেশী সন্দেহ করবে। পুরুষের মতো চল্, পরে যা-হোক একটা বুদ্ধি বার করবার চেষ্টা করতে হবে। বসন্তরই কি উদ্বেগ কিছু কম? কিন্তু কেমন অভিনয় করছে। অভিনয়ই যদি না করতে পারবি, তবে যাত্রা দলের লোক হলি কেন? কিন্তু বসন্ত এত কথা লোকজনের মাঝে বলতে পারে না গোলাপকে।

দেখা হ'ল রাতে। গোলাপ আগে থাকতেই ঘরে ছিল। বিম্‌লিকে পৌঁছে দিয়ে গেল মেয়েরা।

বিম্‌লি দ্বিধাগ্রস্তভাবে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। চোখটা মেঝের দিকে।

আগের দিন রাত্রে পূর্ণর সঙ্গে বাড়ীর সবাই যাত্রা দেখতে গিয়েছিল—বিম্‌লিও। মেয়েদের মধ্যে বসেছিল ওরা। কাল দেখেছে গোলাপকে ধড়াচুড়া-পরা অবস্থায়। কাল তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিম্‌লির সুখ-দুঃখও সাময়িকভাবে এক হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেল, তখন রাধার দুঃখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও কেঁদেছিল—হয়তো একটু বেশীই কেঁদেছিল। কিন্তু তখনও তো গোলাপকে অভিনেতা হিসেবেই দেখেছে, স্বামী হিসেবে নয়। চিনত না সে স্বামীকে, চেনবার কথাও নয়—বহুবছর আগে সামান্যক্ষণের জন্যে দেখেছিল তাকে।

পূর্ণর মনে হয়েছিল, খোঁজ-খবর ক'রে দেখল, সত্যি গোলাপই বটে।

বিম্‌লির আফসোস হ'ল, আগে যদি জানত, তবে নায়ক হিসেবে নয়, স্বামী হিসেবে তাকে দেখত, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। সে বারবার মনের মধ্যে অভিনয়টাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। দেখে দেখে তৃষ্ণা মেটে না।

কথাটা শোনার পর থেকেই বুকের মধ্যে থরথর ক'রে কাঁপতে সুরু করেছিল। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক! সবাই এবং বিম্‌লিও ধরে নিয়েছিল, গোলাপের সঙ্গে আর তার দেখা হবে না—গোলাপ জীবিত কিনা তাই-বা কে জানে। বারো বছর কোন সন্ধান না পাবার পর কেউ কেউ উপদেশ দিয়েছিল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধব্যগ্রহণের জন্যে। পূর্ণর বিশেষ মত ছিল না—কি হবে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে। বিম্‌লি তো মরে আছে, তার শাড়ী-সিঁদুর কেড়ে নিয়ে কি আর সুবিধে হবে; তা ছাড়া সে এক ঝামেলার ব্যাপার। সুতরাং শাড়ী-সিঁদুর তার দেহ থেকে নির্বাসিত হয়নি, কিন্তু দেহে-মনে বৈধব্যকে গ্রহণ করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না।

হঠাৎ ঘোষিত হ'ল, না, সে বিধবা নয়। ঐ সুদর্শন মানুষটি তার স্বামী। যার মুখ ভুলে গেলেও, তার কথা সে বারবার ভেবেছে। ভাববার মূল-সঞ্চয় ছিল খুবই সামান্য, তাই অসামান্য কল্পনার পথে খুঁজত তাকে, পেত তাকে, আর বারবার হারাতো।

রান্নাঘর থেকে দু'একবার চুরি ক'রে দেখেছে গোলাপকে, কিন্তু হাত-পা-বুক কাঁপতে সুরু করল। তাড়াতাড়ি সরে গিয়েছিল চুরির জায়গা থেকে।

কিন্তু এখন? বিম্‌লি অনড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গোলাপও বিমূঢ়, স্থাণু।

কয়েক মিনিট কাটল এমনি। প্রতিটি সেকেণ্ড অতি গুরুভার, মন্থর।

গোলাপ বুঝল, একটা কিছু বলা দরকার। কিন্তু কী কথা? সারা মনের কোথাও একটি শব্দ সে খুঁজে পেল না বিম্‌লির জন্য। সাগরীকে বলতে কথা তার খুঁজতে হয় না, এমনিতেই আসে, অজস্র আসে।

তা ছাড়া ভয়-ভয় একটা ভাব ঘিরে ছিল তার মন। তার বিবেকের পটে একটা অপরাধবোধ সূক্ষ্ম সূচীমুখে রক্তিম অক্ষরে কী যেন লিখছিল।

অনেকবার পাঁয়তাড়া কষে শেষে গোলাপ বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন?' তারপর হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'বসুন।'

বিম্‌লি নড়ল না এক ইঞ্চিও। কথাগুলো রাধা-বেশী কোন পুরুষকে বলা নয়, তাকে বলা! বুকের মধ্যে আলোড়নটা আরো দুরন্ত হ'য়ে উঠেছে। আর বাইরে হাত-পাগুলো অসাড় হ'য়ে আসছে।

বিম্‌লির পরনে একটা লাল শাড়ী। সাজিয়ে দিয়েছে বিন্দুরা। মুখটা সুডোল। দীর্ঘ দেহ, অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী, বহুবছরের সঞ্চিত যৌবন কানায়-কানায় পূর্ণ। সেই ভরা বর্ষার বিলে যেন একটা দমকা হাওয়া লেগেছে, কাঁপছে দেহটা। গোলাপ স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারছে। হাতটা বাড়িয়ে মাথাটা নুইয়ে গোলাপকে প্রণাম করতে আসছে বিম্‌লি। নিজের পা দুটো পেছন দিকে সরাতে গিয়েও সরাতে পারল না গোলাপ।

'আ-হা-হা-হা—' গোলাপ তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল। হাতটা বাড়াল। কিন্তু হাতটা মাঝপথে গিয়ে থমকে গেল—তাহলে ছুঁয়ে ফেলতে হবে বিম্‌লিকে।

কিন্তু বিম্‌লি থামল না। কাঁপতে কাঁপতেও ছুঁয়ে ফেলল গোলাপের পা। একটা পা-র চেটোয় হাতের আঙুলের ডগাগুলো রেখে তার ওপর ভর দিয়েই যেন সে উঠতে চেষ্টা করছে। স্পর্শ নয়, জোরে চাপ পড়ল গোলাপের পায়ে। থরথর ক'রে কাঁপল বিম্‌লির হাতটা; কয়েক সেকেণ্ড, তারপরেই দলা পাকিয়ে পড়ে গেল বিম্‌লি, গোলাপের হাতটা তখনও অর্ধেকটা বাড়ানো।

তাড়াতাড়ি পুরোই বাড়াতে হ'ল এখন। ছুঁতেও হ'ল। বিম্‌লিকে শুইয়ে দিল বিছানার ওপরে। বিভ্রান্তভাবে ডাকল, 'বিন্দু!'

বিম্‌লি চোখ মেলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'কাউকে ডাকতে হবে না। একটু জল—'

এমনিতে বিম্‌লি পল্‌কা গোছের মেয়ে নয়। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও প্রথম সাক্ষাৎকারের ধাক্কাটা সামলাতে পারছিল না। চোখ মেলে তাকিয়ে লজ্জাও হচ্ছিল তার অনিচ্ছাকৃত এই ব্যবহারের জন্য। তার পরিণত যৌবনের চড়ায়-বাঁধা স্নায়ুগুলো ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেছিল গোলাপের স্পর্শে, প্রাণপণে সেই ঝংকারের তৃষার্ত কলরব থেকে মনকে মুক্ত ক'রে সহজ ডাঙায় পা দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল তার চেতনা।

'জল কোথায়?'

বিম্‌লি আবার লজ্জা পেয়ে গেল। সে শুয়ে শুয়ে একে এমন ক'রে খাটাবে? ছি ছি! বিম্‌লি একটা হাতের ওপর ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল।

'থাক্, থাক্। আমি দেখছি।' বলল গোলাপ।

বিম্‌লি আঙুল দিয়ে একটা কোণের দিক দেখিয়ে দিল।

কোণটা অন্ধকার। বিপরীত প্রান্তে রাখা হারিকেনের আলো ক্ষীণ হ'য়ে এখানে একটা আলনায় বাধা পেয়েছে। সেখান থেকে জল নিয়ে এল গোলাপ।

বিম্‌লির সংকোচের শেষ নেই। এর পরে আর শুয়ে থাকা যায় না। চেষ্টা করে উঠে বসল সে। নিল জলের গ্লাসটা গোলাপের হাত থেকে, আর নিজেকে সংযত রাখবার মাত্রাধিক চেষ্টাতেই হাত থেকে পড়ে গেল গ্লাসটা। ভিজল বিছানা।

গোলাপ কিন্তু একটা কিছু করতে পেরে স্বস্তি পাচ্ছিল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ানোর যে অস্বস্তি ও বিড়ম্বনা, সেটাকে খানিকটা আড়াল করা যাচ্ছিল এই কাজগুলোকে দিয়ে।

গোলাপ আর এক গ্লাস জল এনে দিল। আলনা থেকে গামছা এনে দিল। একটা কাপড়ও নিয়ে এল আলনা থেকে। বিছানায় পেতে দিল ভিজে জায়গাটার ওপরে।

বিম্‌লি উঠে বসে ছিল। শুয়ে থাকা যায় না, অন্যে যখন এত কাজ করে। আর একটা কারণও ছিল। শুলে এই পূর্ণ দেহটা যেন মেলে ধরা অবস্থায় বড় বেশী স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে।

'উঠলে কেন? শুয়ে পড়।' বলল গোলাপ।

সে ভেবেছে, বিম্‌লি খুবই অসুস্থ। তাছাড়া, মুখোমুখি বসলে গোলাপের অস্বস্তিটা বাড়ে।

'ঘুমোও।'

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। নির্বাক নৈঃশব্দ্য বিম্‌লির বুকের ওপর চেপে বসতে লাগল। গোলাপেরও অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু কিছু উপায় নেই। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে চলে যায় সেই প্রথম রাতের মতো। কিন্তু তাও আজ সম্ভব নয়।

'এখন কিরকম বোধ করছ?' প্রশ্ন করল গোলাপ।

অনেকক্ষণ ধরেই একটা তীব্র আবেগের মন্থন চলছিল বিম্‌লির মনে। গোলাপের নিরুত্তাপ কোমল কণ্ঠের স্পর্শে হঠাৎ বিম্‌লি বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে হুহু ক'রে কেঁদে উঠল। ফোঁপানির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ দেহের তরঙ্গ দুলে দুলে উঠল। একটা নিদারুণ তীব্র আর্তনাদকে সে সংবরণ করবার চেষ্টা করছে।

গোলাপ প্রথমটায় বিমূঢ় হ'য়ে গেল। কী সান্ত্বনা দেবে সে এ কান্নার!

সাগরী হ'লে গোলাপ পারত। তার লঘুভার তনুকে দুই বাহুর অঞ্জলি পেতে গোলাপ গ্রহণ করত, দুটি হৃদয়ের যুক্ত অঞ্জলিতে সমান অংশ নিতে পারত তার বেদনার। সেই নীরব সান্ত্বনাবাণীর মন্ত্র কেমন ক'রে উচ্চারিত হবে এখানে? দুটি হৃদয়তন্ত্রীর টানা-পোড়েনে যে জীবন দীর্ঘকাল ধরে বোনা হয়েছে, সেখানে একের তন্ত্রীর আঘাত আরেকটিতে স্পন্দিত হয়। এখানে যখন একজন বেদনার্ত, আর একজনের তখন কালো একটা অপরাধবোধ, আর হয়তো বা অতিক্ষীণ একটু সহানুভূতি।

করুণায় একবার গোলাপ হাতটা বাড়াল, অপরাধী চিত্ত মধ্যপথে সে-হাতকে থামাল। বিম্‌লির দেহের তরঙ্গে তখনও নিঃশব্দ আর্তনাদ উদ্বেলিত।

গোলাপ আস্তে হাতটা রাখল বিম্‌লির মাথার ওপর। একগোছা চুলের পরিপাটি খোঁপা—ফুল সেখানে একটা—গন্ধরাজ। বিন্দুরা আজ সাজিয়েছে বিম্‌লিকে তার বহু-বাঞ্ছিত ক্ষণটির জন্য। গন্ধরাজের গন্ধেই গোলাপ যেন পেল রজনীগন্ধার সুরভি—আসবার ঠিক আগে সাগরীর খোঁপায় ছিল রজনীগন্ধার মালা, ছোটবৌ পরিয়ে দিয়েছিল। তিন ছেলেমেয়ের মার তাতে লজ্জা ছিল। আর যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে সাগরীরও সাত-আট বছর আগে, যে ছয় ছেলেমেয়েরও মা ইতিমধ্যে স্বচ্ছন্দে হ'য়ে যেতে পারতো, অথচ যার কৌমার্য আজও অনাঘ্রাত, তার লজ্জা নেই; অথবা লজ্জা করবার সাধ্য নেই তার।

গোলাপ খোঁপাটার ওপরে আস্তে হাত বোলাতে লাগল। আর কিছু করণীয় খুঁজে পেল না।

নেহাত একটা কিছু বলা দরকার ব'লেই বলল, 'আরে, কাঁদছ কেন?'

সে জানত, বিম্‌লি কাঁদছে কেন। প্রশ্নটা নেহাতই অবান্তর।

অনেকক্ষণ বাদে বিম্‌লির ফোঁপানিটা বন্ধ হ'ল। কিন্তু সে মুখ গুঁজেই পড়ে রইল, মুখটা তুলতে পারল না।

গোলাপ আর কয়েকবার মাথাটায় হাত বুলিয়ে বলল, 'কেঁদো না। এবার ঘুমোও। আমিও শুচ্ছি। কাল রাত জাগা গেছে।'

শুয়ে পড়ল সে। বিম্‌লির পাশে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে। সারা রাত্তির দুজনের কেউ ঘুমোল না। দুজনেই ঘুমের ভান ক'রে পড়ে রইল।

সে-রাতে ঘুমোতে চাইল না সোনাও। বিম্‌লিকে গোলাপের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে জানালার ধারে আড়ি পাতবার ইচ্ছে হ'ল তার। বিন্দুকে জোটাল দলে। বিন্দুর মনে ক্ষিধে, মুখে লাজ। যতটা জোরের সঙ্গে তার মত ছিল, ততটা জোরালোভাবেই বলল, 'না।' তারপর নেহাত সোনার পীড়াপীড়িতে সে যেন রাজী হ'ল।

সোনা বসন্তকেও ডাকল, 'ও মশাই, ও শ্যামলী-ধবলী, চলুন মজা দেখে আসি।'

বসন্তর সংকোচ ছিল। কিন্তু এখানে সে বরাবর সহজ হবার অভিনয় ক'রে যাবে ঠিক করেছিল, যাতে কেউ কোনরকম সন্দেহ না করে। গোলাপ তো অতি-আড়ষ্ট হ'য়ে চলছে। সেটুকুও যাতে কারুর চোখে তেমন ক'রে না পড়ে সেই চেষ্টাই সে বরাবর করছে, ফলে এরাও এত তাড়াতাড়ি তার এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গিয়েছে।

কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বসন্ত বলল, 'বেশ তো। সে তো বেশ মজা হবে।'

বসন্তকে দলে টানায় সংকোচ হচ্ছিল বিন্দুর। সে বলল নিরুকে, 'বৌদি চলো।'

'না রে বাপু, আমার আর সেদিন নেই। তোদেরই বা ঐ অন্ধকারে মশার কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার কি? ঘুমোগে যা না।'

'তুমি ঘুমোওগে যাও, তোমায় কেউ ডাকছে না। তুমি দল ভাঙাচ্ছো কেন?' চিড়বিড় ক'রে উঠল সোনা।

নিরু আসবে না শুনে বসন্ত আর একটু বিব্রত হ'ল; কিন্তু এখন আর পিছু হটা যায় না।

তিনজনে জানালার ফাঁক আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল। বার বার কান পাততে লাগল। নাঃ, কিছু শোনা যাচ্ছে না, দেখাও যাচ্ছে না।

সোনা বলল, 'বৌদিটা সব ভেতর থেকে ভালো ক'রে সেঁটে দিয়ে গেছে।'

কথাটা সত্যি। নিরু সোনার এ প্রচেষ্টাটা অনুমান ক'রে আগে থাকতেই ভেতর থেকে সব ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বিম্‌লির এ-রাতের গুরুত্ব সে বোঝে।

নির্জন অন্ধকারে পুরুষের এত নিকট সান্নিধ্যে বিন্দুর কেমন একটা দম-আট্‌কানো ভাব আসছিল, অহেতুক একটা উত্তেজনা বুকের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছিল।

অথচ সোনা অবলীলাক্রমে বসন্তর কাঁধে হাত দিয়ে ধাক্কা মারল: 'সরুন তো শ্যামলী-ধবলী, আপনার দ্বারা কিছু হবে না, দেখি, ওখানে একটা ফুটো আছে বোধহয়। নাঃ, কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

নিরু এসে বলল, 'দূর, কিসব ছেলেমানুষী করছিস তোরা! ঘুমোগে যা।'

সোনা চটে বলল, 'আহা, এখন ভালোমানুষী হচ্ছে। নিজে সব বন্ধ-টন্ধ ক'রে দিয়ে এসে—'

'ওমা, সেকি কথা! আমি আবার কখন কি করলুম? এ মেয়েটার একেবারে মাথা খারাপ। আসুন বসন্তবাবু, আপনি চলে আসুন। আপনিও কি ছেলেমানুষ হলেন নাকি?'

'প্রায় তাই। ঠ্যাং ভেঙে বাছুরের দলে। পচা আমের সঙ্গে মিশ খেলে, ভালো আমও যে পচে যায়, বৌদি।' নিরুর কাছে এসে দাঁড়াল বসন্ত।

'আহা রে, কী আমার ভালো আম! দুধে দিলে ছানা কেটে যায়।' মন্তব্য সোনার।

'সেই ভয়ে তো দুধের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকি।'

সোনা মুখ খুলতে যাচ্ছিল, বিন্দু চাপা গলায় বলল, 'থাম্, সোনা। চল্, শুয়ে পড়ি।'

দু'বোন ঘরে এসে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে সোনা জিজ্ঞেস করল, 'লোকটাকে কেমন দেখলি রে?'

বিন্দু ধমক দিল, 'অসভ্য কোথাকার!'

'আহা, অসভ্যতার কি হ'ল?'

'তোর একটুও লজ্জা করে না, সোনা? এমন করছিলি তুই!'

'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা! ঘোমটা দিলেই পারতিস্। ও, তাও তো ভগবান কপালে লেখেনি। ত্যাখ্ মেজদি, যাকে তাকে লজ্জা করবি তোরা। আমার বয়ে গেছে লজ্জা করতে। ভারী একটা লোক, তার আবার অত! আমি তো একবার লোকটার গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম ওকে জানালা থেকে—'

'ছি ছি, উনি কি ভাবলেন বল্ তো? তুই কি করে যে এসব করিস!'

'কিভাবে আবার? ইচ্ছে করেই তো করলুম। বুঝলি মেজদি, লোকটার মনে একটু আগুন লাগিয়ে দিলুম। জ্বলে-পুড়ে মরুক রাতটা।'

'এসব কি বলছিস তুই সোনা!'

'থাম্। ঘুমো! ঘুম পাচ্ছে। আমার এত খুশী লাগছে যে এখুনি

ঘুমিয়ে পড়ব। ও লোকটা জেগে চোখেমুখে কালি ফেলুক, কাল সকালে উঠে দেখব।' অন্ধকারে চাপা স্বরেই খিলখিল ক'রে হাসল সোনা—যেন আবছা আলোতেও শানানো ছুরি ঝিলিক মেরে গেল।

'সোনা, তুই একদিন সর্বনাশ ঘটাবি।'

'ঘটুক না সর্বনাশ। সর্বনাশে তোর এত ভয় কেন রে মেজদি? তোর সর্বনাশের বাকীটা আছে কি। হোক না আর একটু সর্বনাশ, দেখি কেমন ব্যাপারটা। বেশী ঝাল খেলে চোখ ফেটে জল আসে, তবু ঝাল খেতে ভালবাসিস না তুই? টক বেশী খেলে দাঁত টকে শিরশির করে, তবু গোগ্রাসে টক গিলতে ভালো লাগে না তোর?'

একটা যেন ঠাট্টার সুর আছে কথাগুলোয়। এমন ভয়ংকর কথাগুলো এত হালকাভাবে সে কি করে বলছে! আশ্চর্য হয় বিন্দু, ভয়ও পায়। বিন্দু চুপ করেই রইল। এ-কথার কি কোন জবাব আছে? সোনাটা অদ্ভুত ধরনের বেপরোয়া, নির্লজ্জ। ছোটবেলা থেকেই সে দেশ-সমাজের বাইরে। যাযাবর জীবন। তারপরে দেশ-ভাগ—সব আরো এলোমেলো ক'রে দিয়েছে।

সোনা শাসন মানে না কারো—পূর্ণরও না। হাজার নিষেধ ও বকুনি সত্ত্বেও পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে গল্প করবে; সিনেমা দেখতে গিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট লাল ক'রে এদিক-ওদিক চোখ বাঁকিয়ে তাকাবে আর পিক ফেলবে, মুখে যা আসবে তাই বলবে; ভিজে কাপড়ে গঙ্গাস্নান ক'রে আসবে হেলতে-দুলতে।

পূর্ণ শান্ত ও দুর্বল। তাও সে আগে-আগে রাগারাগি করত। মুখরা সোনা একদিন সহ্য করতে না পেরে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে, 'অত যদি ভয়, বিয়ে দিয়ে দাও না। সে-মুরোদ তো নেই। ভদ্দরলোক হব কি ক'রে? লেখাপড়া শিখিয়েছ একটুও?'

পূর্ণর দুর্বল হাতের কর্ম নয় এ ঘোড়ার লাগাম ধরা।

হতাশ হ'য়ে সে হাল ছেড়ে দিয়েছে: 'যাক শালা, সব গোল্লায় যাক! ঘরে একদিন আগুন লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাব যেদিকে দু'চোখ যায়।'

বিন্দুর ঘুম আসে না সোনার ভবিষ্যৎ ভেবে। আর বসন্তবাবুই বা কি ভাবলেন কে জানে। ভালো কিছু ভাবেননি নিশ্চয়ই। ছি, কী লজ্জা!

সকালেই গোলাপ খুব ব্যস্ত হ'য়ে বলল, 'পূর্ণদা, আমরা চলি। আমাদের একটু বাইরে যেতে হবে—লালগোলা। কাজ আছে।'

'তা এত তাড়া কিসের? লালগোলা তো পাঁচশো মাইল দূরে নয়।'

'না না, সে অনেক কাজ।'

'পরশু তো আবার তোদের এখানে পালা।'

'কালই বিকেলে ফিরব আমরা। চল্, বসন্ত।'

লালগোলার ট্রেনে গোলাপ জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, কথা বলছিস না যে?'

'কি বলব?'

'কিরকম দেখছিস?'

'দেখছি—বেশ। বিন্দু মেয়েটা খুব ভালো, সোনা—'

বসন্ত লোকটা অদ্ভুত। চরম একটা সংকটের মধ্যেও মেজাজটা রাখে আশ্চর্য নিরাসক্ত, এমনকি রসিকতাও করতে পারে সেই মুহূর্তে।

'রাখ্ তোর সোনা।' বাধা দিল গোলাপ। 'এখনও তোর ইয়ারকি আসছে, আশ্চর্য!'

'কি করি! জট মারাত্মক হ'য়ে পাকিয়েছে।'

'হুঁ। এখন?'

'বুদ্ধি কিছু মাথায় আসছে না রে।'

হরগোবিন্দের বাড়ী আরও একটু জীর্ণ হয়েছে। জীর্ণতর হয়েছে হরগোবিন্দের দেহ। তবু আতিথ্যে ত্রুটি ঘটল না। মহেশ আর মহেশের বৌ যথেষ্ট আদর-যত্ন করল।

পারুলের সঙ্গেও দেখা হ'ল—সে এসেছে বাপের বাড়ী। সে খুব অনুযোগ করল: 'কেন সাগরকে নিয়ে এলেন না? বেশ দেখা হ'ত। কতদিন দেখি না ওকে। কেমন আছে? ভালো?'

অসংখ্য খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞেস করল সাগরী সম্বন্ধে। গোলাপের আশ্চর্য এক সূক্ষ্ম ব্যথা লাগছিল প্রতিটি প্রশ্নে। সাগর আর সাগর—পারুলের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ যেন সে জীবন্ত এক অশরীরী উপস্থিতিতে ভরে ফেলল গোলাপকে। এখানকার ঘরদোরের সঙ্গেও যে সাগর অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে মিশে রয়েছে। কিন্তু গোলাপ যেন ভালো ক'রে তাকে ধরতে পারছে না। ধীরে সে সরে যাচ্ছে দূরে—তার জগৎ থেকে গোলাপের নির্বাসন।

পারুলের ফুটফুটে একটা মেয়ে এবাড়ী-ওবাড়ী ছোটাছুটি করে, পারুলের ওপর যখন-তখন যা-তা আবদার করে।

পারুল সস্নেহে বলে, 'দেখেছেন মেয়েটার কাণ্ড?'

সাগরী সম্পর্কে পারুল একসময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'খোকন কেমন আছে? কত বড় হয়েছে এখন? আর মেয়েরা?'

না জেনেই করেছে প্রশ্নটা। ইদানীং বিশেষ যোগাযোগ নেই পারুলের সঙ্গে তাদের।

গোলাপ বলল, 'খোকন নেই।'

পারুল বোবা হয়ে গেল। বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা করেনি এমন একটা নিদারুণ উত্তরের। নিজের মেয়েকে বুকে জোর ক'রে চেপে ধরে অনুভব করার চেষ্টা করল গোলাপ-সাগরীর দুঃখ।

তারপরে যতখানি সময় ছিল গোলাপ লালগোলাতে, পারুল এক আশ্চর্য মাতৃসুলভ মমতায় তাকে যেন দু'বাহুতে আগলে রাখতে চেয়েছে। পুত্রশোকটা গোলাপের কাছে একটু পুরানো, সুতরাং সহনীয়। কিন্তু পারুলের কাছে সংবাদটা নতুন—গোলাপের ক্ষতের পরিমাণ তাই ও ধরত নতুনের মাপে। ভাবত, সাগরীর এখন বড় দরকার গোলাপের কাছে-কাছে থাকা। উভয়ে উভয়ের সান্ত্বনা।

পারুল বলল, 'কী পোড়া কাজ যে করেন! বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো সব সময়! একটা থিতু চাকরী নিতে পারেন না?'

'হুঁ, তাই নিতে হবে।' গোলাপ নিজের মনেই বলল।

গোলাপের চোখের দৃষ্টির অস্বাভাবিকতা পারুলের নজর এড়ায়নি। এখন মানেটা তার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল—পুত্র-বিয়োগের ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি এখনও গোলাপ।

পুরানো বহু কথা উঠল। সেদিন কত তুচ্ছ ছিল সে-সব ঘটনা। আজ তার প্রতিটি বিন্দু নতুন মাধুর্যে পূর্ণ।

'মনে আছে, আপনাদের প্রথম বাসর কিন্তু আমিই তৈরী ক'রে দিয়েছিলাম ঐ ঘরে শেকল দিয়ে?'

খুব মনে পড়ে। আরো কত কথা মনে পড়ছে সেই সঙ্গে। কিন্তু এক অজানা আশঙ্কায় গোলাপের সারাটা মন কাঁপছে। এই পারুল, তার ফুটফুটে দুরন্ত মেয়েটি, মহেশ, মহেশের গ্রামীণ বৌ, হরগোবিন্দের জীর্ণ ঘর-বাড়ী—সব আজ তার কাছে বড় ভালো লাগছে। এই ভালো-লাগার মধ্যে একটা করুণ সুর; অজ্ঞাত এক শক্তি যেন তাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ জগৎ থেকে।

এক অস্থির মন নিয়ে সে পারুলকে দেখছিল। পারুল যেন অনেক দূরে—দিগন্ত-পার থেকে ভেসে আসছে তার স্নিগ্ধ মাতৃ-কণ্ঠস্বর।

'পারুল, কোলকাতা গেলে আমাদের ওখানে এসো।'

'আসবো, গোলাপদা—নিশ্চয়ই আসবো। সাগরকে দেখে আসব—কতদিন দেখি না ওকে। ঘর-সংসার দেখে আসব সাগরের।'

রাত্রে গোলাপ চিঠি লিখল সাগরের কাছে।

'...এ আমার কি হ'ল, সাগর? লালগোলায় এসেছি।' এখানে তো সব জায়গায় তুমি। কিন্তু আমি তোমার মুখ মনে করতে পারছি না। যেমন মাঝে-মাঝে হয় আমার খোকনের বেলায়, যত তার মুখ মনের মধ্যে দেখতে চাই, তত ভেঙে-ভেঙে যায় মুখটা। কিন্তু এখনও যে ফিরতে অনেক দেরী। কখন আমি তোমার মুখটা আমার দু'হাতের মধ্যে নেব, আর দেখব, দেখব, দেখব!...পারুল আছে এখানে। তার সঙ্গে কত গল্প হ'ল—সবই প্রায় তোমার সম্বন্ধে। পারুল মেয়েটা বড় ভাল। ওর ফুটফুটে মেয়েটার দুরন্তপনায় ও যখন বিরক্ত হয়, তখনও মায়ের স্নেহ ওর সারাটা মুখে ছড়িয়ে থাকে—সে-আলোয় তুমি বোধহয় ওকে দেখনি, সাগর। দেখলে, তোমার খোকনের কথা মনে পড়ে যেত।...ভালো লাগছে না কিছু। মনে হচ্ছে ছুটে চলে যাই তোমার কাছে। তুমি হয়তো ভাবছো, এ আমার কী হ'ল, এত অস্থির কেন আমি! তুমি তো জানো, মাঝে মাঝে আমার ঐরকম হয়। কেন হয়—বুঝি না, কী যে চাই—পাই না। বড় কষ্ট হয়। তখন তোমাকে আমার দরকার—নিশ্বাস নেবার বাতাসের মতো দরকার। নইলে সত্যি নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় আমার।...তুমি এই রাতে এখন কী করছ? রুনু-ঝুনুকে নিয়ে শুয়েছো বোধহয়। আশ্চর্য! তুমি, রুনু, ঝুনু, ভবন-দাদু, ছোটবৌ, আমাদের রাজপ্রাসাদ, সেই শোবার ঘরটা, রান্নাঘরটা, জানালার ধারের জমিটুকু—সব কিছু অদ্ভুত অলীক মনে হচ্ছে। সত্যি সব আছে তো তেমন? গিয়ে সব তেমনি পাব তো? ...কিন্তু এসব কী আবোল-তাবোল বকছি আমি? কিছু মনে কোরো না, সাগর, বড় অস্থির লাগছে আমার। যা মনে আসে তাই তোমায় বলি। আর কাকে বলবো, আর কে আছে আমার? ...'

সাগর পড়ল চিঠিটা। সুরু করেনি সে অধীরতা নিয়ে, কিন্তু আরম্ভ করেই ছুটতে হ'ল প্রতিটি শব্দের ওপর দিয়ে অধীর আগ্রহে। গোলাপের অস্থিরতা তার মনেও সঞ্চারিত হ'য়ে এল। কী এক অস্থির বেদনা যে এক-এক সময় পেয়ে বসে এই স্পর্শকাতর পুরুষটিকে—কিছুতেই সাগর মুছে দিতে

পারে না তার জ্বালা, বড় অসহায় ও ব্যর্থ মনে হয় নিজেকে ; আর এখন তো লোকটা কত দূরে। কি ক'রে নেবাবে ঐ মনের অজ্ঞাত-কারণ দাহ ?

শুধু নিজেকেই আরো অস্থির ক'রে তোলা যায়। অপরের মনকে সুস্থির করা হয় না।

রুনু এসে বলল, 'কোথায় খেলব ?'

'কেন, মাঠের কি হ'ল ?'

সাগরীদের ঘরের জানালার সামনের একচিল্‌তে জমি, এ বাড়ীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় তার নাম মাঠ।

'মাঠে ঢুকতে দিচ্ছে না, রেলিং দিচ্ছে।'

মনে পড়ল সাগরীর, শুনেছে সে, মাঠের মালিক ওখানে বাড়ী তৈরী করবে, শীগ্‌গিরই ভিত খোঁড়া হবে। তার কিছু কিছু উদ্যোগ-আয়োজন বুঝি সুরু হ'ল।

'তা আমি কি করব ?' ঝাঁজের দু'এক কণিকা ছিটকে বেরোল মুখের কথায়। না বেরিয়ে উপায় আছে ?—মেয়েটা কথা বলছে এমনভাবে যেন সব দোষ সাগরীর। গোলাপ বাড়ীতে থাকলে রুনু বেশ শান্ত, বাপের খুব অনুগত মেয়েটা। গোলাপ বাইরে গেলে বিগ্‌ড়ে যায় ; দু'একদিন প্রথমে গুম হ'য়ে থাকে, তারপরে হয় একগুঁয়ে অবাধ্যতার সুরু, যত দিন যায় তত বাড়ে। সাগরী সামলাতে পারে না। আবার গোলাপ এলেই মেয়েটা পাল্‌টে যায়।

রুনুও ঝাঁজের সঙ্গেই এখন উত্তর দিল, 'খেলব কোথায় ?'

'যে গোল্লায় মন চায় সেখানে যা। রুনু, জ্বালাসনে আমায় ! রাস্তায় যা।'

রুনু গজগজ করতে করতে বেরচ্ছিল, ঝুনু কেঁদে উঠল : 'আমি যাব, মা।'

'তুই আবার কোথায় যাবি ?'

'দিদির সঙ্গে—মাঠে।'

'রুনু, ওকে নিয়ে যা।'

'পারব না আমি।' মুখ-ঝামটা দিল রুনু ; থামল না।

'নিয়ে যা ওকে, রুনু।' চীৎকার ক'রে ধমক দিল সাগরী।

রুনু ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

'আচ্ছা, ফিরে আয়, দেখাব'খন !' শাসাল সাগরী। যদিও সে জানে শাসানিকে ভয় করে না রুনু।

ঝুনু চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিল।

'থাম্, ঝুনু। তোরই বা অত বাইরে যাবার দরকার কি।'

ঝুনু এসব কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না।

সাগরী দুমদুম ক'রে দু'ঘা বসিয়ে দিল ঝুনুর পিঠে।

ঝুনুর চীৎকার তীব্রতর হ'ল।

ভবন-দাদু বাইরে থেকে ওপরে উঠছিলেন। থামলেন।

'কি হ'ল, আমার ঝুনুদিদির কি হ'ল? তুমি মেরেছো রাণীমা?'

'ভারী অসভ্য হ'য়েছে।'

'এ বয়সে অমন হ'য়েই থাকে। …এসো তো দিদি, আমার কোঁলে এসো।'

কোলে এসেও থামল না ঝুনু।

'নাঃ, হাজার হ'লেও রাজকন্যে তো, মেজাজই আলাদা। এ আমার কর্ম নয়। চল বাপু, তোমায় ছোট-বৌমার জিম্মায় দিয়ে আসি।'

ঝুনুর কান্নাটা ক্রমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দূরাগত ক্ষীণ শব্দটাও মিলিয়ে যাচ্ছে। সাগরী একা ঘরটাতে। জানালাটার ধারে এসে দাঁড়াল সে। সামনের জমিতে কয়েকজন লোক ফিতে দিয়ে মাপামাপি করছে। শিশু ও কিশোরদের কোলাহলে জায়গাটা মুখর থাকত—পাড়ার ঠেসাঠেসি ঘরগুলোর বাইরে এখানে এসে ওরা পেত একটু নিশ্বাস ফেলবার জায়গা। একটা শিশু-কিশোরের দল দূর থেকে ফিতে-ওয়ালাদের দেখছে। ওদের মধ্যেই হয়তো রুনু আছে—ঠিক দেখা যাচ্ছে না।

কিছু ভালো লাগছে না সাগরীর। রান্নাঘরে গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিল মনটাকে।

কিছুক্ষণ বাদে ছোটবৌ ঝুনুকে কোলে ক'রে নিয়ে ফিরল। ঝুনুর হাতে বিস্কুট—কান্না থেমে গেছে।

'কি, তুমি ওকে মেরেছো কেন?'

জবাব দিল না সাগরী। চালের কাঁকর বাছতে লাগল একমনে।

'কি, কথা বলছ না যে? তোমার হাত বড় বেড়েছে, না? আসুক না ওর বাবা, তাকে ব'লে তোমার মজাটা একবার দেখাই, তবে আমার শান্তি!'

গোলাপ ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত-তোলা পছন্দ করে না, জানে ছোটবৌ।

সাগরী নির্বিকারভাবে চাল বাছতে থাকে।

ছোটবৌ এগিয়ে এল। সাগরীর মুখটা ভালো ক'রে দেখতে দেখতে বলল, 'সাগররাণীর হ'ল কি?' আরো কাছে এসে থুতনি ধরে তুলল মুখটা। 'এ যে মেঘ নেমেছে মুখে! হ'ল কি?'

সাগরী মুখটা ছাড়িয়ে নিল ছোটবৌর হাত থেকে।

'চিঠিপত্র এসেছে নাকি? কী লিখেছে চিঠিতে?'

সাগরী চাল বাছতে লাগল।

চটে উঠল ছোটবৌ। 'মর্‌গে যা' ব'লে চালের থালাটা পাশে-বেছে-রাখা কাঁকরের ওপরে উলটে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাগরী ডাকল, 'শোন্ ছোটবৌ, যাসনে। দাঁড়া।'

থামল ছোটবৌ। ঘুরে দাঁড়াল।

'হ্যাঁরে ছোটবৌ, চিঠিপত্র ছাড়া বুঝি কারো মন-খারাপ হ'তে নেই?'

ছোটবৌ কাঁকর-মেশানো চাল আবার তুলে নিল থালাটাতে। বাছতে সুরু করল।

'কথা বলছিস না যে?'

ছোটবৌ নীরবে চাল বাছতে লাগল।

'কি রে?' জোরে ধাক্কা দিল সাগরী।

ছোটবৌ খিল খিল ক'রে হেসে সাগরীকে জড়িয়ে ধরল: 'প্রতিশোধ।'

'ছাড়্। লাগছে আমার।'

'ও, লাগছে? এই আধ-মণী হালকা আমি ধরেছি, তাতেই এমন চেঁচাচ্ছিস্ যে মনে হচ্ছে, গলায় কেউ ফাঁস লট্‌কে দিয়েছে। আর যখন দেড়-মণী—'

'মা, বাবা কোথায়?' বিস্কুটটা শেষ ক'রে প্রসন্নচিত্তে জিজ্ঞেস করল ঝুনু।

চুপিচুপি বাড়ীতে ঢুকল ঝুনু—পা টিপে টিপে।

মেয়ের ভীত মুখটা দেখে মায়া হ'ল সাগরীর। বাপ-সোহাগী মেয়ে—বাপের অভাবে হেদিয়ে মরছে। আর বাপও হয়েছে তেমনি—আসবার নাম নেই। শুধু পারেন হিজিবিজি একগাদা চিঠি লিখে মানুষের মন-খারাপ করতে।

পরদিন বিকেলে গোলাপ আর বসন্ত ফিরে এল বহরমপুরে। গোলাপের ইচ্ছে ছিল রাতটা ভালো ক'রে ঘুমোবে। সেই কৃষ্ণের পালা করবার পরের

রাত কেটেছে বিম্‌লির সঙ্গে এক ঘরে; আর দ্বিতীয় রাত লালগোলার সেই ঘরে, যেখানে পারুল তাদের বাধ্য করেছিল প্রথম-বাসর-যাপনে।

কোন ঘরেই তার ভালো ঘুম হয়নি। এক ঘরে একটি প্রত্যক্ষ নারী, আর এক ঘরে একটি পরোক্ষ নারী তাকে ঘিরে ছিল।

ভেবেছিল তৃতীয় রাতটা ভালো ক'রে ঘুমিয়ে নেবে। পরের দু'রাত আবার পালা আছে। যাত্রাদলের লোকদের যে গুদামঘরটায় থাকতে দিয়েছে, সেটা খুব সুখকর নয়, কিন্তু গোলাপ ওসবে অভ্যস্ত, আর ঐ দুটো ঘরের চেয়ে আজ রাতের পক্ষে গোলাপের কাছে গুদামঘরটাই ভালো।

কিন্তু পূর্ণ এসে উপস্থিত হ'ল। নিয়ে যেতে এসেছে। গোলাপ ইতস্তত করছিল—এড়াবার একটা অজুহাত খুঁজছিল। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে ঘরে রেখে নিজেকে এই গুদামঘরে রাতের মতো পুরতে হ'লে যতটা জোরালো অজুহাত দরকার, তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

দাসমশাই আরো বেয়াড়া ক'রে তুললো ব্যাপারটা। বলল, 'যাও, মামার বাড়ীর দুধভাত দু'দিন পেয়েচো যখন তখন খেয়ে এসো। এখানে যা খাওয়াচ্চে, বুল্লেন মশাই, সে আর কি বলব! যাও গোলাপবাবু, ঘুমিয়েও এট্টু সুখ পাবে। এখানে, আরে ছোঃ ছোঃ, গুদোমঘরটায় কী বিচ্ছিরি গন্ধ, সারারাত ইঁদুর খটখট করে। ভয়ে মরি, এই বুঝি কুটুস ক'রে কামড কষায়। আর মশা—উঃ।...হ্যাঁ, গোলাপবাবু বসন্তবাবু, লালগোলায় কোথায় গিইলে—শ্বশুরবাড়ী না মেসোর বাড়ী কী যেন বললে?'

গোলাপ চম্‌কে উঠল। দাসমশাই আলোচনাটাকে মারাত্মক দিকে নিয়ে চলেছে। পূর্ণদের সে সাগরী-সংক্রান্ত কিছু জানাতে চায় না। দাসমশাই সেটাই তুলে ফেলেছে। গোলাপের মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে যেতে লাগল।

বসন্ত তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার মেসোর বাড়ী—'

'অ, মেসোর বাড়ী! আমি শুনেছিলুম, শ্বশুরবাড়ী।'

'না, মেসোর বাড়ী। আমার মেসো। গোলাপ, চল্‌। দাসমশাই ঠিক বলেছেন, দুধভাতটা মাঠে মারা যেতে দেওয়া ঠিক নয়।'

'আহা, বসন্তবাবু, তা তুমি লাফাতে লাফাতে চললে কোথায়? তোমারও কি নেমন্তন্ন নাকি?'

পূর্ণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়ীর মেয়েরা ব'লে দিয়েছেন।'

'গোলাপবাবুর জন্যে আমার ভাবনা নেই। কিন্তু বসন্তবাবু, "হায় সতী

ললাটে তোমার এই ছিল লেখা—" সেই জায়গাটা মুখস্থ আছে তো, নইলে এট্টু রিস্ক্যাল্—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুখস্থ করছি। ওটা আমার পকেটে আছে।' ওরা তিনজন চলতে আরম্ভ করেছে।

'আছে? আচ্ছা।...পূর্ণবাবু, দেখবেন এট্টু কোথাও গাওনার দরকার-টরকার হ'লে—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখব।'

আবার সেই বাড়ী। সেইসব লোক। গোলাপরা চলে যেতে বাড়ীটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, আবার উৎসাহে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কথাবার্তায়, হাসি-ঠাট্টায় খুশীর স্রোতের মতো সময় চলল। বসন্ত জমিয়ে তুলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আড়াল ক'রে রেখেছিল ফ্যাকাশে-মুখ গোলাপকে।

গোলাপের মনে সূক্ষ্ম আতঙ্কটা ঘোরাফেরা করছিল।

কাল-পরশু দু'রাত ওদের পালা আছে ব'লে পূর্ণ তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করার ব্যবস্থা করল।

নিরু মুচকি হেসে চুপি-স্বরে স্বামীকে বলল, 'তুমি অত তাড়া দিচ্ছ কেন? পালা আছে ব'লেই ঠাকুরপো অমনি আজ রাতে ঘুমোচ্ছে কিনা!'

'আরে, তাহ'লেও তো ওদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে দেওয়া দরকার।'

গোলাপ ভাবছিল, যত দেরী হয় শুতে যেতে, দরকার নেই তার সুখ-শয্যার ঘুমের, গুদামঘরই ছিল ভালো।

বসন্তকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছিল সোনা—একটা নিষ্ঠুর আনন্দে। বিন্দু বোনকে সংযত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল, আর ভাবছিল, ছি ছি, উনি কী ভাবছেন! সোনাটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে! আজ রাতেও গোলাপদের ঘরে সোনা আড়ি পাততে চেয়েছিল। বিন্দু বসন্ত কেউ রাজি নয়। সোনা ক্ষুব্ধচিত্তে শুতে গেল—একা আড়ি পেতে সুখ নেই।

সেই পরশু রাতের ঘর—গোলাপ-বিম্‌লির বাসর। আবার দুজনে মুখোমুখি। বিম্‌লির মুখটা আনত। গোলাপ একবার তাকিয়েই সরিয়ে নিল চোখটা। তাকাবে না সে বিম্‌লির দিকে। হারিকেনটা নিভিয়ে দিলেই মুখটা ডুবে যাবে অন্ধকারে।

গোলাপ বলল, 'শুয়ে পড়।'

হারিকেনটা নিভিয়ে দিল।। বিম্‌লি তখনও সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে-থাকা দেহটা চারদিক থেকে একটু অন্ধকার জড়িয়ে নিয়েছে।

গোলাপের মনে হ'ল, বড় তাড়াতাড়ি করছে সে, সবটাই হ'য়ে উঠছে খাপছাড়া, অস্বাভাবিক।

নিজের দিকটা একটু ব্যাখ্যা করবার জন্যেই বলল, 'কাল-পরশু পালা আছে তো, আমার একটু ঘুমোনো দরকার।'

দীর্ঘ সবল দেহটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সেই অন্ধকার-জড়ানো নারীকে গোলাপের ভয় করছিল এখন। সে কি একবার পলকে তাকাল গোলাপের দিকে? অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না। নীরব ঔদ্ধত্যে দৃঢ় বিম্‌লি।

গোলাপ বলল, 'এই—ইয়ে, ট্রেনে এলাম তো, ঘুম পাচ্ছে।'

নিজের কানেই গলাটা শোনাল অদ্ভুত—মিইয়ে-পড়া। এই ধরনের উচ্চারণই তার বক্তব্যকে অসার প্রতিপন্ন ক'রে দিচ্ছে যেন।

বিম্‌লি এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। কাঁদছে নাকি? অথবা রাগে চোখ-দুটো জ্বলছে? তাকালো কি আর একবার গোলাপের দিকে? নাকি তাকিয়েই আছে মেয়েটা বরাবর? আবছা অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ভুল করেছে, গোলাপের মনে হ'ল। গোলাপ ভয়টাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল: 'আরে, দাঁড়িয়ে কেন?'

হাসলও একটু। সামান্য অভিনয় করতে হবে। দমলে চলবে না। বিম্‌লির হাত ধরে এনে তাকে বসাল বিছানাতে। সহজ গলায় বলার চেষ্টা করল, 'নাও, শুয়ে পড়। বড় ঘুম পাচ্ছে আমার।'

গোলাপ নিজের জায়গাটাতে শুয়ে পড়ল। নিঃশব্দে অত্যন্ত মন্থর গতিতে সময় কাটতে লাগল। গোলাপ ভাবটা দেখাল, যেন সে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমোতে সে পারছিল না। সাগরী ছাড়া কোন মেয়ের এত নিকট সান্নিধ্যে সে আসেনি। অস্বস্তি হচ্ছিল। বিম্‌লি এখনও কাঠ হ'য়ে বসে আছে। গোলাপ আবছা অন্ধকারে চোখ চেয়ে মাঝে মাঝে দেখছে, আর অস্বস্তি বাড়ছে।

বিম্‌লি উঠে দাঁড়িয়েছে। বাপ-মার একমাত্র মেয়ে—আদুরে, একগুঁয়ে। সে-দিন আর তার নেই সত্যি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে পুড়ে মরছিল, সেই

দাহটাই যেন একটা শক্তি হিসেবে তার মধ্যে কাজ করছিল, সেটাই ঠেলে তুলল তাকে। দরজার কাছে এসে খিলটায় হাত দিতেই গোলাপ বলল, 'দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ?'

বিম্‌লি খিলটা শক্তহাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

গোলাপ তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে এল। দাঁড়াল তার পেছনে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

বিম্‌লির মধ্যে সেই শক্তি তখনও সক্রিয়। বলল, 'তুমি ঘুমোওনি?'

বিম্‌লির গলায় হয়তো বিদ্রূপ ছিল না, কিন্তু গোলাপের কানে শোনাল তেমন। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বিন্দুদের ঘরে।'

'কেন, কেন?'

'ওখানেই শুই আমি।'

'এখানে অসুবিধে হচ্ছে?'

বিম্‌লি বলল, 'না, এমনি।'

'না, না। সে-যে বড় লজ্জার হবে।'

খিলটা শক্ত ক'রে ধরে কান্নাটা চাপতে চাপতে বলল, 'পনেরো বছরের ওপর যদি এ-লজ্জা সহ্য করতে পারলুম, তাহ'লে—'

এই মুহূর্তে বিম্‌লির জন্যে গোলাপের দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু কী সান্ত্বনা সে দেবে? বলল, 'না। বিন্দুদের ঘরে কেন যাবে?'

হঠাৎ বিম্‌লি ঘুরে গোলাপের বুকের ওপরে এসে অস্থির ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তবে কোথায় যাব আমি? গতি কোথায় আমার? কী করেছি আমি—কী করেছি তোমার? কী দোষ করেছি? আমায় মারো—মেরে ফেল আমায়!'

গোলাপ ধরল তার দুটো বাহু: 'দোষ তোমার নয়, দোষ আমাদের বরাতের, বিম্‌লি—'

পর পর দু'দিন দোকানদারদের উদ্যোগে যাত্রা হ'ল। খুব ভালো হ'য়েছে দুটো পালা-ই—'বিয়ে-পাগ্‌লা কুলীন' আর 'রামের বনবাস'। বাসন-ব্যবসায়ীরা পালা দুটো দেখে খুশী হ'য়েছে, তারা যাত্রা করাবে দু'দিন বাদ দিয়ে—পর পর তিন রাত্তির।

বিম্‌লি দুটো পালাই দেখেছে। নতুন ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছে

গোলাপকে। গোলাপ ঘরে তার কাছে কেমন জড় হয়ে থাকে। আর এখানে এত লোকের মধ্যে এত সহজে এসে দাঁড়ায়; কত সুন্দর কথা বলে।

'বিয়ে-পাগলা কুলীন' দেখতে দেখতে বিমলির হাসির তোড় এসে গিয়েছে এক-এক সময়। কুলীন বুড়ো অনেকগুলো বিয়ে করেছে—বিয়ে করাই পেশা তার। সব বৌ থাকে বাপের বাড়ী। দুজন থাকে কাছে। এই দুই বৌর টানা-হ্যাঁচড়া বুড়োকে নিয়ে, আর তার মধ্যে বিমূঢ় কুলীন বুড়ো; দু'বৌর ঝগড়া এবং কুলীন বুড়োর একই সঙ্গে দুটো দাম্পত্য-জীবন—এই নিয়ে হাসির পালা।

আর 'রামের বনবাস' দেখে বিমলি কেঁদেছে। প্রথমে কী সুন্দর আরম্ভ। রাম বড় হচ্ছে, রাক্ষস বধ করল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বিয়ে করল সীতাকে—মধুর সে দাম্পত্য-জীবন। তারপর কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় ছারখার হ'য়ে গেল রাম-সীতার সুখের দিন—বনবাসের আদেশ এল পিতার। বনবাসী রামের দুঃখে বিমলি কাঁদল, মনে মনে গেল রামের সঙ্গে অনেক দূরে, পঞ্চবটীর অরণ্যকুটীরে।

ভালো লেগেছিল বাসন-ব্যবসায়ীদের। দু'দিন বাদে তিনটি পালা হবে—ঠিক হ'ল। 'রামের বনবাস' শেষ হ'তেই তাঁরা দাসমশাইর সঙ্গে কথা পাকা ক'রে গেল ঐ রাতেই।

রাত আর বেশী বাকী ছিল না। গুদামঘরে যাত্রাদলের সবাই শুয়ে পড়ল। দাসমশাই খুব খুশী—মনে-মনে টাকার হিসেব করছিলেন। গোলাপটা ভালো পার্ট করে, আর পয়মন্ত আছে।

গোলাপেরও ঘুম আসছিল না। ভোরবেলা যখন দাসমশাই-ও ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর গুদামঘরে যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত সৈনিকদের মতো অন্যেরা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তখন বেরিয়ে পড়ল গোলাপ।

ট্রেনে চেপে সোজা কোলকাতা।

সাগরী আশ্চর্য হ'য়েছিল। কিছু জানায়নি তো গোলাপ। বরং আগের চিঠিতে মনে হ'য়েছিল, আরো দেরী হবে।

গোলাপ ছেলেমানুষের মতো সাগরকে জড়িয়ে ধরে। বলে, 'আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না, সাগর—পারব না! আমার বড় কষ্ট হয়।'

'তুমি অমন করছ কেন? ওগো, কি হয়েছে তোমার?'

'কি হয়েছে? না, কিছু হয়নি। সত্যি, কিছু না। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় ভয় করে আমার। যেন তুমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছ, অনেক দূরে, খোকনের মতো দূরে। খোকন আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে, তুমিও—'

'ওগো, কেন তুমি বাজে-বাজে কথা ভেবে মিছে কষ্ট পাও?'

'বাজে নয়। নইলে বহরমপুরে গিয়ে আমি তোমার মুখ মনে করতে পারছিলুম না কেন? যতবার তোমায় ভাবতে যাই, ততবার—' থেমে যায় গোলাপ, ততবার যে অন্য-একটা মুখের ছায়া এসে পড়েছে। এ কী করছে সে? সাগরীকে সে বলতে চায় না বিম্‌লির কথা। বিয়ের সময় থেকে এই ব্যাপারটাতে যেমন গোপনতা অবলম্বন করেছে, আজও তাই করতে হবে। কিন্তু তার অস্থিরতায় যে সাগরীর সন্দেহ হ'তে পারে। এখানেও তাকে অভিনয় করতে হবে। বিয়ের বছরগুলোতে সে অভিনয় করেছে, কিন্তু তখন বিম্‌লি বাস্তবে ছিল না বললেই হয়, সেই মৃত ঘটনাকে আড়াল করা তেমন শক্ত ছিল না। এমনকি, অনেকবার ভেবেছে, পুর্ব-কৃতির স্বীকৃতি মারফত পাপ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেনি; পারেনি, মুখে আট্‌কে গেছে কথা। কষ্ট পেয়েছে সে প্রেমের ক্ষেত্রে এই লুকোচুরির জন্যে, কিন্তু আলোয় আসতে পারেনি সে সম্পূর্ণটা, তার নিজের খানিকটা বরাবরই রাখতে হয়েছে আড়ালে।

কিন্তু আজ বিম্‌লি আবার বেঁচে উঠেছে। তার অস্তিত্ব আজ অতি-প্রখর, গোলাপের জীবনের মূল ধরে সে টান দিয়েছে। এখন সাগরীর সঙ্গে অভিনয় আরো দুষ্কর, দুঃসহ।

তবু সে হঠাৎ মুখটা তুলে হাসে: 'তুমি নিশ্চয়ই আমায় পাগল ভাবছো? এক-একদিন হয় অমন, খোকনের কথা মনে পড়লে—'

থামতে হ'ল গোলাপকে। খোকনের স্মৃতির জ্বালা তার আছে, তাকে অস্থিরও ক'রে তোলে মাঝে মাঝে, সত্যি। কিন্তু আজকের ছুটে আসার কারণ খোকন নয়। খোকনের নামটা মিথ্যে ক'রে আনতে হচ্ছে ব'লে নিজের ওপরেই রাগ হ'ল। কিন্তু খোকনই একমাত্র অবলম্বন এই ক্ষেত্রে।

গোলাপ হঠাৎ খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়: 'সাগর, আজ একটু ভালো ক'রে রাঁধো দেখি। ওখানে যা আজেবাজে জিনিস খাওয়াত সে তোমায় কি বলবো।'

রুনু-ঝুনুকে নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে সে বেড়াতে বার হয়। রুনু খুশী হয়েছে, ঝুনু কোলে চেপে বসেছে।

রুনু বলে, 'এ মা! এতবড় মেয়ে কোলে উঠেছে।'

গোলাপ বলে, 'থাক্, রুনু। ঝুনুটা আবার হয়তো রেগে-মেগে কান্না সুরু করবে, তাহ'লেই ব্যস্, বুঝলি—'

আসলে বেশ ভালো লাগছিল ঝুনুকে বুকের ওপর নিয়ে হাঁটতে। ওর মধ্যে রেণু রেণু হ'য়ে মিশে আছে সাগরী। ঐ ছোট্ট মেয়েটাই তাকে সাগরী সম্পর্কে যেন নিশ্চিন্ত অভয় জানাচ্ছিল—ক্ষুদে মেয়েটার প্রতিটি স্পর্শে এই নীরব বাণী গোলাপের কাছে ঘোষিত হচ্ছিল—'সাগর আছে, সাগর আছে তার জীবনে'।

কলকাতার এই নোংরা গলিটাকে বোধহয় কোনদিন এত ভালো লাগেনি। কী চমৎকার সব। প্রতিটি বাড়ী চেনা, লোকজন চেনা। অনেক লোকের সঙ্গে হয়তো আলাপ নেই, কিন্তু দীর্ঘকাল পাড়ায় থাকার ফলে সবার মুখ চেনে সে, জানে তাদের ইতিবৃত্ত। এইসব মুখ-চেনা অনালাপিত পড়শীদেরও আজ তার আত্মীয় বলে মনে হ'ল।

বড়রাস্তায় এসে পড়ল গোলাপ। ট্রাম ও বাসের আওয়াজ—তার সঙ্গে সঙ্গত করছে আরো হরেকরকমের শব্দ।

বহু লোকজনের মধ্যে বেরিয়ে হঠাৎ একটু ভয় হয় গোলাপের, কে জানে এই জনতার মধ্যে হয়তো পূর্ণর পরিচিত কেউ থাকতে পারে, হয়তো সে চিনে ফেলতে পারে গোলাপকে, এই স-সন্তান গোলাপের বেড়ানোটা গল্প করতে পারে। বিয়ের ঠিক পরে-পরে এইরকম ভয়টা তার খুব বেশী করত। ক্রমে কমে গিয়েছিল। আবার হঠাৎ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে।

একটু ঘুরেই ফিরল গোলাপ। মনের প্রফুল্লতা কিছুতে বজায় থাকছে না।

সাগরী তাকে দেখে হেসে বলল, 'বেশ মশাই, রান্না করো ব'লে বেরিয়ে যাওয়া হ'ল! এদিকে রান্নাটা হবে কী ঘোড়ার-ডিম, ঘরে বিশেষ কিছু নেই। মেয়েগুলোকে ঘাড়ে ক'রে ঘুরলেই হবে? বাজার যেতে হবে না?'

'সেইজন্যেই তো ফিরলাম।' মিথ্যে করেই বলল গোলাপ। 'দাও। ঝুনু, এবার নামো তো মা-লক্ষ্মী।'

'না, নামব না, তোমার সঙ্গে যাব বাজারে।'

সাগরী বলল, 'নাও, এবার সামলাও। আদর দিয়ে-দিয়ে তো মেয়েগুলোকে মাথায় তুলছো।'

গোলাপ অনেক বুঝিয়ে লজেন্সের প্রলোভন দেখিয়ে ঝুনুকে কোল থেকে নামাল।

সাগরী বলে, 'শোনো, বাজার যাওয়ার মুখে বসন্তদাকেও অমনি ব'লে যাও। একটু ভাল-মন্দ রাঁধব। ও তো হোটেলে খায়, নয়তো হাত-পা পুড়িয়ে রান্না করে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

'বসন্ত তো ফেরেনি।'

'ফেরেনি ? সেকি ! গেল কোথায় ?'

'যায়নি কোথাও, বহরমপুরেই আছে।' হেসে সহজ হবার চেষ্টা করে গোলাপ : 'তোমাকে তো বলাই হয়নি, বহরমপুরে আমাদের আরো তিন পালা গাওনা হবে, দল তো ওখানেই রয়েছে, বসন্তও ওখানে···আমার ভালো লাগছিল না।'

আকস্মিক একটা আবেগের জোয়ারে সাগরীর বুক ভরে গেল। গোলাপের মুখের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি কোমল হ'য়ে আসে। এই মানুষটা, যার এখনও কাজ পড়ে রয়েছে সেই কত দূরে, সেইখান থেকে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হ'য়েছে তারই জন্যে। কিন্তু কেমন ক'রে সে ঐ বুকটার সকল তৃষ্ণা মেটাবে! অথচ মাঝে মাঝে ঐ বুকটার মধ্যে যে তীব্র আলোড়ন চলে, তার আভাস সাগরী ওপর থেকেও পায়। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল সাগরীর—নিজের ব্যর্থতায়; কেন পারে না ঐ বুকটার যন্ত্রণা-কাতর সব আলোড়নকে নিমেষে শান্ত ক'রে দিতে!

গোলাপ বাজারে চলে গেল।

সাগরী গেল রান্নাঘরে।

একটু বাদে ছোটবৌ এসে উপস্থিত : 'কি গো সাগররাণী, মুখে যে আর হাসি ধরে না। তা হবেই-বা না কেন? এ তো আর শুকনো একখানা কাগজে কালির ইকড়ি-মিকড়ি আঁচড় নয়, খোদ জলজ্যান্ত মানুষটা।'

'হুঁ, আমার মুখে বুঝি হো-হো হাসি শুনতে পাচ্ছো?'

'সব হাসি কি শুনতে হয়? অনেক হাসি দেখতেও হয়।'

'আমার হাসিটা কোথায় দেখছো? নাকের ডগায় না কানের লতিতে?'

'নাকের ডগা থেকে কানের লতি, পায়ের আলতা থেকে চুলের কাঁটা পর্যন্ত সব জায়গায়।'

গোলাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল বসন্ত। সে বুঝতে পেরেছিল, গোলাপ কোথায় গেছে।

দাসমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে: 'কী সর্বনাশ বলুন তো, বসন্তবাবু। তিন-তিনটে পালা সামনে, আর ইদিকে আমার "হেরো" গায়েব!'

'আঃ, আপনি বুঝতে পারছেন না। গোলাপ একটু কাজে কোলকাতায় গেছে, আমায় ব'লে গেছে আপনাকে বলবার জন্যে, ভোরে তখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। ঠিক সময়ে এসে পৌছবে—পালার খবর সে জানে।'

'আসবে তো বসন্তবাবু, ঠিক? দেখবেন মশাই, শেষে ভরাডুবি না হয়। তার অবশ্য মহড়া না হ'লেও চলে, কিন্তু—'

'এখন চুপচাপ থাকুন দাসমশাই, বাসনওয়ালারা যদি জানতে পারে যে, আপনার "হেরো" গায়েব, তবে আপনাকে তুলো ধুনে দেবে।'

'ওরে বাবা! হে বাবা বিশ্বনাথ—'

'যান, গিয়ে বিশ্বনাথের নাম করুন গে।'

নটবর এসে জিজ্ঞেস করল, 'গোলাপদা গেল কম্‌নে?'

দাসমশাই খিঁচিয়ে উঠল: 'কম্‌নে তা তোমার দরকার কি বাপু? বেরোও এখান থেকে।'

নটবর ভড়কে গেল: 'লে ব্বাবা, বাইরে একটা লোক ডাকছে গোলাপদাকে, তাই বল্লু, তা আমায়ই তো দিচ্চে হাঁকড়ে—'

'বাইরে ডাকচে? কে ডাকচে? ব'লে দাও, দেখা হবে না। একটা "হেরো", তার সঙ্গে যখন-তখন দেখা! চালাকি নাকি? ব'লে দাও, এ যে-সে অপেরার "হেরো" নয়, বঙ্গ-অপেরার "হেরো", অত সস্তা নয় দেখা করা। এখন দেখা হবে না।'

নটবর বেরিয়ে যাচ্ছিল।

দাস আবার তাকে ডাকল: 'এই ছোঁড়া, শোন্। চললি যে, কী বলবি লোকটাকে?'

'যা বললেন আপনি।'

'আহা কী যুধিষ্ঠির রে আমার! দাঁড়া। কে এয়েচে? বাসনওয়ালারা নাকি।'

'চিনি না।'

'তা চিনবি কেন? ভাত গিলতে পারিস—ভাত? ও বসন্তবাবু—'

'দেখছি আমি, ও বোধহয় গোলাপের মামাতো ভাই—'

'অ, বুইচি। চলো তো দেখি নতুন বায়নার খবর-টবর আনলো নাকি।'

সত্যি, পূর্ণই দাঁড়িয়ে ছিল।

'চলুন বসন্তবাবু—'

'চলবেন তো, কিছু হ'ল-ট'ল, অ পূর্ণবাবু?' প্রশ্ন করল দাস।

'না। গোলাপ কোথায়?'

দাস বসন্তকে চোখ টিপে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

বসন্ত বলল, 'ও একটা জরুরী কাজে—মানে আমাদের দলের জরুরী কাজে—কোলকাতা গেছে, আজকালের মধ্যেই ফিরবে, আবার তিনখানা পালা রয়েছে তো এখানে। তাড়াতাড়িতে আপনাদের ব'লে যেতে পারেনি, আমায় ব'লে গেছে আপনাদের বলতে।'

'চলুন—'

'কোথায়?'

'আপনাকে দেখামাত্রই তো আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করেছি। আর গোলাপের থেকে আমরা আপনাকে আলাদা ক'রে দেখি না'

'আরে, আরে, ওসব কথা কেন? চলুন—'

'অবশ্য আজ একটু স্বার্থ আছে।'

'কী স্বার্থ?'

'আপনি গিয়ে বৌমাকে গোলাপের কথাটা বুঝিয়ে বলবেন।'

'এটা শুধু আপনার স্বার্থ কেন? চলুন।'

গোলাপের হঠাৎ কোলকাতা যাওয়াটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার তা বসন্ত তার নিজের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছিল। বসন্তর নিছক উপস্থিতি অনেক কাজ করল। আর বসন্তর উপস্থিতি কোন সময়ই নীরব নয়। সে বাড়ীতে বেশ হৈচৈ বাধিয়ে তুলল।

'আজ তো কপালে ভালো খাওয়া নেই, বেশ বুঝতে পারছি।'

নিরু ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কেন?'

'নিরু-বৌদি আজ বাজার থেকে ভালো জিনিস আনবেই না—দেওর নেই তো আজ। আর গোলাপ-বৌদি তো আজ নির্ঘাৎ রান্নায় পোড়া লাগাবে—গোলাপের ভাবনা ভাবতে ভাবতে।'

সোনা টিপ্পনী কাটল, 'শ্যামলী-ধবলী নয়, এ যে দেখছি পেটুক গণেশের ছুঁচো!'

বিল্টু চুপি-চুপি বলল, 'আচ্ছা বৌদি, অত ভয় হ'লে না-হয় আমি রাঁধছি।'

পুর্ণ হেসে বলল, 'আচ্ছা, বাজারটা না-হয় আমিই করছি, আর রাঁধবে বরং—'

উস্কে দেবার জন্মেই বসন্ত বলল, 'সোনা।'

'বয়ে গেছে আমার ঐসব বাজে লোকজনের জন্মে রাঁধতে!' ঠোঁট ওল্টালো সোনা।

'দেখুন বৌদি, অতিথি হ'ল ঠাকুর—'

'ওরে আমার উড়ে বামুন-ঠাকুর রে—' বলল সোনা।

'নাঃ বৌদি, এ আপনার একেবারে কচুবনের সোনা। কচুবনে দেখেন নি কোনদিন সোনা চিকচিক করছে? দেখেই আপনি গেলেন আনতে, ব্যস, তড়াক ক'রে এক লাফে সোনা চলে গেল—মানে সোনা-ব্যাং। আপনার তখন চক্ষু চড়কগাছ।'

'তবু তো সোনা-ব্যাং আছি। নিজের কোলা-ব্যাঙের মতো চেহারাটা আয়নায় একবার দেখলেই হয়।'

'দেখি তো, কচু-সোনা। একবার নয়, অনেকবার। যাত্রার সাজ করতে হয় যে। ···যাকৃগে, কচু-সোনা যখন গররাজি, তখন আজ আমিই রান্না করব, আমিই আজ উড়ে বামুন-ঠাকুর হ'য়ে যাব।'

সবাই ভেবেছে ঠাট্টা, কিন্তু বসন্ত গিয়ে রান্নাঘরে কাজ সুরু ক'রে দিল। রান্নার ব্যাপারে তার পারদর্শিতা ও মেয়েলিপনা দেখে সবাই বিস্মিত।

সোনা বলে, 'ওমা, এ যে মেয়েদের হার মানায়! তাই তো ভাবি, গোলাপদার এত বছর বৌ ছাড়া চলল কি করে? ওগো মেজবৌদি, সতীনটির গুণপনা দেখছো?'

বিমলি হেসে ফেলল। সে এমনিতে খুব কম হাসে, বিষন্নতার একটা স্থায়ী দাগ আছে তার মুখে। কিন্তু সোনার কথার ভঙ্গিতে না হেসে উপায় ছিল না।

সতীন কথাটা বসন্তর কানে হঠাৎ বিশিষ্ট হ'য়ে উঠল। মুহূর্তের জন্মে সাগরীর মুখ মনে পড়ল তার। কিন্তু তাড়াতাড়ি সেটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'কচু-সোনা, তুমি আমায় রেঁধে খাওয়াতে গররাজি, তাই আজ আমি তোমায় রেঁধে খাওয়াব। মা-কালীর দিব্যি ক'রে বলবে কার রান্না ভালো।'

সোনা অবশ্য খেতে বসে বহু রকমের খুঁত বার করল। কিন্তু অন্য সবার ভোটে বসন্তর রান্না বেশ ভালো নম্বরই পেল।

বিন্দু চাপা হেসে নিরুকে বলল, 'বৌদি, এবার আমাদের রান্না ছাড়তে হ'ল দেখছি।'

সোনা বলল বিম্‌লিকে, 'মেজবৌদি, আর একটু ভালো ক'রে রান্নাটা শেখো, নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।'

'কপালে দুঃখ থাকলে কি আর রান্নায় খণ্ডাবে!' করুণ হেসে বলল বিম্‌লি।

রাত। সবাই শুয়ে পড়েছে। বসন্ত তার ঘরে বসে কাগজে লেখা পার্টগুলো দেখছে, সোনা এসে ঘরে ঢুকল: 'এত রাত জেগে কি হচ্ছে? বৌকে চিঠি লিখছেন নাকি?'

'হায় রে কচু-সোনা, মাথা নেই তার মাথাব্যথা!' দুঃখের অভিনয় ক'রে বলল বসন্ত।

'আর কতকাল কবন্ধ হ'য়ে কাটাবেন? মাথা নিয়ে আসুন।' তির্যক চাউনি ফেলল সোনা বসন্তর চোখে। 'বলেন তো, আমি না-হয় দেখি।'

'বাঃ, মুণ্ডুর সওদাও করো তাহ'লে তুমি। আমার ধারণা ছিল শুধু বুঝি কথার সওদা করো।'

'ভুল ভাঙলো তো?'

'হুঁ। তুমি তাহ'লে নিজের একটা মুণ্ডু যোগাড় করো আগে—একটু স্বার্থপর হও।'

'সারা বাড়ির লোকের কাছে আমার স্বার্থপর ব'লে নাম আছে, জানেন? আপনাকে আর পরামর্শ দিতে হবে না। এ ঘটকালিটা যে আমার নিজের স্বার্থে নয়, তাই বা জানলেন কি করে?' আবার তির্যক চোখের শানিত আলো ফেলল সোনা বসন্তর চোখে।

মনে মনে চম্‌কে উঠল বসন্ত। কী বলতে চায় সোনা? মুখ দিয়ে তার বেরল, 'মানে?'

'একটু চম্‌কে উঠলেন মনে হ'ল। ধরুন, আমাদের বাড়ীতেও তো বয়স্কা মেয়ে আছে। নেই? দেখেননি?'

'দেখেছি। দেখছি।'

'যাক্‌গে, ছেড়ে দিন ও-কথা। একটুতেই আপনি এমন ভয় পেয়েছেন যে সারা রাত বোধহয় ঘুম হবে না।' চোখের কোণে হাসছিল সোনা।

'আমার ঘুম না-হয় নাই হ'ল, এবার তোমার একটু ঘুম হ'লেও তো হয়।' একটু থেমে কণ্ঠ থেকে পরিহাস-তরলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'এত রাত হ'ল, শোওনি যে?'

'শুয়েছিলুম।'

বসন্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'ঘুম এলো না।'

'কেন?'

'বা রে, ঘুম না-আসাটার সব সময় 'কেন' থাকে নাকি?'

'তাহ'লে এমনি?'

'আজ অবশ্য ঠিক এমনি নয়।'

'তবে?'

'ভাবছিলাম।'

'কি?'

'আপনার কথা নয়।' আবার চোখের কোণে হাসি ঝিকিয়ে উঠল—ধারালো ছোরার মতো।

'জানি। কার কথা?'

'শুনবেনই?'

'তোমার যদি আপত্তি না থাকে—'

'গোলাপদার কথা।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়। অদ্ভুত লাগে আমার গোলাপদাকে।' সোনার গলায় হালকা সুরটা নেই। বরং গভীরই যেন শোনাল গলাটা। 'লোকটাকে দেখলে কেন যেন বড় দুঃখী মনে হয় আমার।'

'কেন দুঃখী মনে হয়?'

'তা ঠিক জানি না।'

'তুমি গোলাপকে খুব ভালবাস, তাই না?'

হঠাৎ সোনা আবার স্বরূপে ফিরে এল: 'শুধু গোলাপদাকে? না, না।' চোখের কোণটা শানিয়ে উঠল, ঠাট্টা করছে, না সত্যি কিছু বলছে, বোঝা দায়।

বসন্ত বলল, 'যাও, শোও গে, রাত হ'য়েছে। আমায় একটু এগুলো দেখতে হবে।' 'এগুলো' অর্থাৎ তার পার্ট।

সোনা আরো ভালো ক'রে বসে বলল, 'যাব না আমি। এই বসলুম। দেখি আপনি কি করতে পারেন।'

'কিছুই করতে পারি না। তোমাদের বাড়ীতে তুমি বসবে, তা আমি কী করব, আশ্চর্য! ভালো ক'রে বোসো, সোনা, পা তুলে আরাম ক'রে বোসো।'

বসন্ত সামনের কাগজে মন দিল।

'কেন, বসবই বা কেন? আপনার হুকুম? বসব না আমি।'

বসন্ত মুখ না তুলেই বলল, 'আচ্ছা, তাহ'লে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'ভারী দায় পড়েছে আমার। আমি চললুম।'

দুপদুপ ক'রে চলে গেল সোনা ঘর থেকে।

হাসল বসন্ত।

সোনা এসে শুয়ে পড়ল তার জায়গাতে।

পাশ থেকে বিন্দু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলি রে?'

সোনা একটু চমকাল—বিন্দু জেগে আছে তাহ'লে! সে ভেবেছিল, বিন্দু ঘুমিয়েছে। বলল, 'লোকটার মনের আগুনটা একটু উস্‌কে দিয়ে এলাম।'

বিন্দু একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'সোনা, আগুন নিয়ে খেলা করতে নেই।'

'আগুন নিয়ে খেলা করতেই তো আনন্দ।'

'না সোনা, কী কাণ্ডই যে তুই ঘটাবি শেষে, আমার বড় ভয় করে। তুই একটু সামলে চলিস।'

বিন্দু জেগে আছে ব'লেই চটেছিল সোনা; তারপর এই মোড়লীতে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল: 'ওরে আইবুড়ো বুড়ী, তুই নিজে একটু সামলে চলিস, তাহ'লেই হবে, আমাকে তোর সামলাতে হবে না।'

তীব্র ওষুধের গন্ধে সাপ যেমন মুখটা সরিয়ে গুটিয়ে যায়, তেমনি সংকুচিত হ'য়ে গেল বিন্দু। তার সবচেয়ে নরম জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছে সোনা। অতিকষ্টে বলল, 'বেশ, আর কিছু বলব না তোকে।'

কিন্তু সোনার মুখের বিষ একটা দংশনে তৃপ্ত হয়নি, আরো একবার দংশন করল সে, 'আচ্ছা মেজদি, নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্ তো, ধর্ যদি আমি তোর কথামতো সামলে না চলি, যদি লোকটাকে বিয়েই ক'রে ফেলি, তুই সইতে পারবি? বুকটা তোর ফেটে যাবে না?'

'ওরে থাম্, ঘাট হ'য়েছে আমার, থাম্ তুই এখন।' তারপর নিজেকে একটু সুস্থির ক'রে নিয়ে বিন্দু বলল, 'সোনা, শোন্। যদি তেমন দিন সত্যিই আসে, তবে আমার বুক ফাটার ভাবনা, তুই করিস না, তুই বিয়ে ক'রে ফেলিস। নইলে তোরও এই বুড়ী আইবুড়োর দশা ঘটবে।'

তারপর আর ওরা কোন কথা বলল না। পাশাপাশি শুয়ে রইল দুটি নারী। ঘুমিয়ে নয়, স্পষ্ট চেতনা ও মুখর মন নিয়ে জেগে রইল। জেগে রইল তাদের যন্ত্রণা ও বেদনা, আশা ও আশঙ্কা, তাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ। রাত্রির অন্ধকারে পাশাপাশি পড়ে রইল দুটি দেহ—নারীদেহ। কালো রাত জমাট বাঁধল তার চারদিকে। বহু কামনা ও কান্না নিঃশব্দে আছড়ে পড়তে লাগল ঐ স্থির দেহতীরে। দুটি যৌবনের মধ্যাহ্ন-সূর্য জ্বলে রইল তাদের দাহ নিয়ে দুটি ভিন্ন আকাশে।

রাতে পালা। বিকেলে ফিরল গোলাপ।

দাসমশাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে বসে ছিল। বলল, 'ভ্যাখো তো গোলাপবাবু, কী মুশকিল তোমরা সব কর—'

'মুশকিল কোথায়, আমি তো ঠিক সময়েই এসে গেছি।'

বসন্ত বলল, 'আমি তো দাসমশাই, আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ও আজ বিকেলে আসবে।'

গোলাপ তাকাল বসন্তর দিকে।

বসন্ত আড়ালে এসে বলল, 'আমি এদিকে তোর মামাবাড়ী সামলাচ্ছি।'

'খুব বাঁচিয়েছিস।'

পর পর তিন রাতে তিন পালা। 'সীতার বনবাস', 'বৃষকেতু', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব'।

গোলাপকে দেখবার জন্যে বিম্‌লির মনে প্রচণ্ড একটা উৎকণ্ঠা জেগে ছিল। 'রামের বনবাসে' দেখেছে শেষ। এইতো সেদিনের কথা, কিন্তু বিম্‌লির মনে হচ্ছে কত যুগ হ'য়ে গেল। যেন 'রাম' বনবাসেই চলে গিয়েছে—চোদ্দ বছরের জন্যে। কিন্তু রাম সীতাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে গোলাপ নিয়ে যায়নি।

বিম্‌লি আর এখন নিজেকে দর্শক হিসেবে বিচ্ছিন্ন ক'রে যাত্রা দেখতে পারে না। গোলাপকে আসরে দেখামাত্র সে নিজেও তার অজ্ঞাতসারে

কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যায়। গোলাপের প্রতিটি কাজ ও কথার তাৎপর্য খুঁজে বার করে বিম্‌লি তার নিজের জীবনে। গোলাপকে আর সে বিশেষ কাহিনীর নায়ক হিসেবে ত্মাখে না, ত্মাখে নিজের জীবনকাহিনীর নায়ক হিসেবে। ফলে, পালা দেখতে-দেখতে সে কাঁদে, হাসে, যন্ত্রণায় কাতর হয়, প্রেমের মিলনে শিহরিত হয়, যেন প্রতিটি ঘটনা তারই জীবনে ঘটছে; বাড়ী এসেও ঘুম হয় না, মাথার মধ্যে দিয়ে তার জীবনকাহিনীর স্রোত চলতে থাকে, অসম্ভব উত্তেজনার মধ্যে কাটে সময়। যাত্রার গল্পে করুণ রস তার মনে কোন রসের উদ্রেক করে না, শুধু দুঃখকর ঘটনাটা তার মনের সঙ্গে লেপ্‌টে যায়, আর আশঙ্কা হয় যে এ ঘটনা তারই জীবনে ঘটছে। যাত্রা দেখায় এখন সে বিশেষ কোন আনন্দ পায় না, আনন্দের জন্যে তার আগ্রহও নয়, আগ্রহ তার ভবিতব্যের ইঙ্গিত পাঠের জন্য। ব্যর্থ মানুষ যেমন রোজ দু'বেলা জ্যোতিষীর কাছে ছোটে, তেমনি নেশায় বিম্‌লিও ছোটে। একটা পালা দেখে এসে মাথার মধ্যে নানা জট পাকায়, দ্বিতীয় পালা দেখবার জন্য অধীর হ'য়ে ওঠে; ভাবে, দ্বিতীয় পালাতে কিছু মিলবে; দ্বিতীয় পালা দেখবার পর জট আরো জটিল হয়। এমনি ক'রে এক-একটা দিন চলে, এক-একটা রাত।

'সীতার বনবাসে' বিম্‌লি নিজের অজ্ঞাতসারেই সীতায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। গোলাপ তাকে নির্বাসন দিল। ছটফট করতে লাগল বিম্‌লি। মেয়ে-সাজা ছেলে-সীতাটাকে শান্ত বেদনার সঙ্গে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করতে দেখে বিম্‌লি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। বিম্‌লি বহু বছর কাটাল নিঃসঙ্গ বনবাসে। কিন্তু সীতার লব-কুশ ছিল, আর বিম্‌লির? তারও কি সন্তান আসবে—পুত্রসন্তান? যাত্রাদলের লব-কুশকে ঘিরে তার মাতৃস্নেহ উদ্বেল হ'ল, তাদের কোলের মধ্যে টেনে এনে সমস্ত চেতনা নিঃশেষ ক'রে তাদের স্পর্শ গ্রহণ করবার কামনা তাকে পেয়ে বসল; তাদের দেহের কচি-শিশু-সুলভ ঘ্রাণ দূর থেকেই যেন বিম্‌লির নিশ্বাসকে ভরে দিচ্ছিল। লব-কুশের বীর্যে তার বুক ভরে উঠল, চোখে জল এলো। দৃশ্যান্তরে এখনও গোলাপ সীতা-ভক্ত সভাসদদের বোঝাচ্ছে, সীতার নামে যে কলঙ্কের কথা উঠেছে, তাই সীতা অগ্রাহ্য। বিম্‌লি নিজের মনে বারবার প্রতিবাদ করল, না না, সে কলঙ্কিনী নয়; সুদীর্ঘকাল তার কেটেছে গোলাপ-বিরহিত তপ্ত-যৌবন-শয্যায়, কিন্তু দেহে-মনে সে কাউকে গ্রহণ করেনি কোনদিন।

বিম্‌লির মধ্যে যে মা জেগে উঠেছিল লব-কুশের আবির্ভাবে, সেই মা

শিউরে উঠল 'বৃষকেতু' দেখতে গিয়ে। গোলাপ কর্ণ, স্বভাবতই নিজেকে সে রূপায়িত করেছিল 'পদ্মা'য়। গোলাপ নিজহাতে পুত্র বৃষকেতুকে বলিদান দিল, যন্ত্রণায় কাতর হ'ল বিম্‌লি—বৃষকেতু যে তারও ছেলে। কী দরকার ছিল এর? কাল যে গোলাপ লব-কুশের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল, তাতে তার কোন অগৌরব হয়নি, বৃষকেতুর কাছেও যদি সে হার মানত, তবে পিতৃস্নেহের গৌরবে সে উজ্জ্বল হ'ত, এ অগৌরব নয়। কিন্তু পুরুষ জাতটা বড় অবুঝ আর অহংকারী। থরথর ক'রে কাঁপছিল গোলাপের হাত, ঘাম ঝরছিল, উত্তেজনায় অধীর ছিল গোলাপ। বিম্‌লি একবার ভেবেছিল, গোলাপ পারবে না এই পুত্রহত্যা করতে। কিন্তু কাঁপতে-কাঁপতেও সে পারল। যাত্রার পদ্মার আর্তনাদের সঙ্গে নিজের আর্তনাদ মিশিয়ে দিয়ে আঁচলে চোখ ঢাকল বিম্‌লি। পুরুষ বড় নিষ্ঠুর।

সত্যিই গোলাপ অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত হ'য়েছিল বৃষকেতু-বলিদানের দৃশ্যে। কিন্তু সে অন্য কারণে, খোকনের ছায়া পড়ছিল বৃষকেতুর মুখে। কিন্তু দর্শকরা তা বোঝেনি, অভিনয়-কুশলতা ভেবে খুশী হয়েছিল।

বোঝেনি বিম্‌লিও, বোঝার কথাও নয়।

তৃতীয় পালা চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-কাহিনী—বাংলাদেশের অশ্রুসজল অতি-আপন আখ্যান। গোলাপের পেছনে পড়ে রইল বিষয়-বৈভব, মায়ের স্নেহ, ঘর-সংসার; পড়ে রইল বিম্‌লি ব্যর্থ জীবনের মর্মান্তিক হাহাকার নিয়ে—গোলাপ চলে গেল। 'নাই, নাই, নাই!'—গোলাপ নেই বিম্‌লির জীবনে। দুঃসহ সে শূন্যতা।

রোজই পূর্ণ গোলাপকে অনুরোধ করেছে ওদের বাড়ী এসে থাকতে। গোলাপ নানা ওজর তুলেছে—কাজের অসুবিধা, দাসমশাই চটে যাবে, বাড়ীতে ঘুম হয় না—আড্ডা হয়, ইত্যাদি। এড়িয়ে গেছে গোলাপ; বলেছে, 'পরে যাওয়া যাবে, এখন নয়।'

তৃতীয় রাতের পালা শেষ হ'তে পূর্ণ এল গোলাপের কাছে: 'তোদের দল নাকি কাল চলে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুইও কাল যাচ্ছিস নাকি?'

'যেতেই হবে—চাকরী।'

'চল্ তাহ'লে বাকী সময়টুকু বাড়ীতেই থাকবি।'

গোলাপের অজুহাত কিছু ছিল না। তা ছাড়া মনের দিক থেকে সে খুশী ছিল। একটা মুক্তির হাওয়া লাগছিল তার মনে—কাল সে বহরমপুর ছাড়তে পাবে। সুতরাং এটুকু স্বার্থত্যাগ আজ তার কাছে তেমন কিছু নয়।

গুদামঘরের একটা ধারে অনেকগুলো বড় বড় কাঠের বাক্স—তার মধ্যে সাজ-সরঞ্জাম তোলা হচ্ছে। মেজেতে এধারে ওধারে অনেকে গড়াচ্ছে, কেউ আধশোয়া অবস্থায় বিড়ি ফুঁকছে। কয়েকজন এখনও ধরা-চূড়া ছেড়ে বেশমুক্ত হচ্ছে, রংচং তুলছে। তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল গোলাপ আর বসন্ত। বসন্ত ছাড়া একা পূর্ণদের বাড়ী যেতে বুক এখনও কাঁপে গোলাপের। বসন্তর উপস্থিতিটুকু গোলাপকে সাহস দেয়।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েরা। গোলাপ ও বসন্ত আসতে, বাড়ীমুখো এগোলো ওরা একসঙ্গে।

রাস্তায় কথাবার্তা কম হ'ল। দু'চারটে কথা হ'ল যাত্রা সম্পর্কে।

মুখরা সোনাও একটু ঝিমিয়ে ছিল। কারণ আছে তার। পালা ও পালার অভিনেতাকে নিজের জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু বিম্‌লিই দেখছিল না, দেখছিল সোনাও।

এবং হয়তো বিন্দুও।

দোকানদারদের ওখানে যেদিন 'রামের বনবাস' হল, আর এদের এখানে 'সীতার বনবাস', দু'দিনই লক্ষ্মণ করেছিল বসন্ত। বিন্দু আর সোনা নায়ক রামকে দেখেনি তা নয়, দেখেছিল, গোলাপদাকে আরো বেশী ক'রে ভালবেসেছিল, গোলাপদার জন্য গর্ব বোধ করেছিল। এমনিতেই গোলাপ সম্পর্কে তাদের একটা বিশেষ মমতা আছে। কিন্তু গোলাপ দাদা, আর বসন্ত দাদার বন্ধু, সুতরাং দুজনকে দেখার দৃষ্টি আলাদা। আশ্চর্য, বসন্ত লোকটা জীবনেও যা, অভিনয়েও যেন তাই—গোলাপের ছায়া, রাম-গত-প্রাণ লক্ষ্মণ, নিজের ভাবনা-চিন্তা সুখ-দুঃখ যেন সবসময় চাপা থাকে, কেউ জানে না, বোধহয় উর্মিলাও নয়। লক্ষ্মণ সীতার দুঃখেই সবসময় অভিভূত, বসন্তরও বিম্‌লির সুখ-দুঃখ সম্পর্কে একটা উৎকণ্ঠা আছে। উৎকণ্ঠাটা এত বেশী যে, সোনার মাঝে মাঝে রাগ ধরে যেত, বাক্যবাণে বিঁধতেও ছাড়েনি, কিন্তু লোকটার চামড়া এমন শক্ত কিছু দিয়ে মোড়া যে সোনার বাণগুলো না বিঁধে ফিরে আসে।

'বৃষকেতু'-তে বসন্ত ছিল অর্জুন। কর্ণের প্রতি মমতা তাদের ছিল, কিন্তু পাণ্ডব-কৌরব-দ্বন্দ্বে সকলেরই সহানুভূতি তো পাণ্ডব-পক্ষে; আর পাণ্ডব-পক্ষকে

অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব গাণ্ডীবধারীর। বেশ ভালো লেগেছিল অর্জুনকে—চমৎকার অভিনয় করেছিল।

তেমনি খারাপ লেগেছিল 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবে'র নিতাইকে, অত 'হরি' 'হরি' ব'লে চীৎকার সহ্য হয়নি সোনার। সারা পালাটাই জোলো মনে হ'য়েছে। কথা নেই বার্তা নেই, সব লোকগুলো হৈ হৈ ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাচ্ছে।

পালার ভূমিকাগুলোর সঙ্গে মানুষগুলোও তালগোল পাকিয়ে মিশিয়ে যাচ্ছিল। গোলাপ আর বসন্ত অভিনয় করবার সময় মাঝে মাঝে সচেতন হ'য়ে যাচ্ছিল তাদের আসল জীবন সম্পর্কে, আর দর্শকদের এরা যাত্রার ভূমিকাগুলোর পাশে পাশে সূক্ষ্মভাবে সঞ্চরণ করছিল। মঞ্চ আর প্রেক্ষাগৃহ পরস্পরের সীমারেখা অতিক্রম ক'রে একাকার হ'য়ে যাচ্ছিল।

আবার সেই ঘর। আর সেই মানুষ—গোলাপ আর বিম্‌লি। অভিনেতা ও দর্শক। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ। এতক্ষণ মনের দিক দিয়ে নিজ পরিধি যে যা ভাঙুক, বাস্তবক্ষেত্রে পরিধিটুকুকে মানতে হচ্ছিল, এখন অকস্মাৎ স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকায় দুজন সামনাসামনি দাঁড়াল, একটি বৃত্তপরিধির মধ্যে দুটি প্রাণ স্পন্দিত হ'তে থাকল, নিশ্বাস নিল একই বাতাস থেকে। একটি মাত্র ছোট ঘর, আরো ছোট একটি শয্যা। রাত বাকী ঘণ্টা আড়াই।

আর বিপরীত ঘটনা ঘটল অন্যদের কপালে। সোনা বা বিন্দু পালার মধ্যে তবু বুঝি প্রচ্ছন্নভাবে বসন্তর অনেক কাছে ছিল। এখন অকস্মাৎ স্বতন্ত্র হ'ল তারা। মধ্যিখানে রইল একটা দেওয়াল।

ইটকাঠের দেওয়াল নেই বিম্‌লী আর গোলাপের মধ্যে। দেওয়াল আছে গোলাপের মনে—দুজনের মধ্যে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। এখন বিম্‌লির মুখোমুখি দাঁড়াতেই সেই দেওয়ালটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল। রাতের পর রাত কত শত দর্শকের সামনে নিপুণ অভিনয় সে করেছে, এখানে একটি নারীর সামনেও তাই করতে হবে—ঠিক করল গোলাপ। কালই তো সে সাগরীর সান্নিধ্যের শান্তি আবার ফিরে পাবে।

বিম্‌লি স্পষ্ট-চোখে তাকাল গোলাপের দিকে। এত স্পষ্ট-চোখে তাকাতে এর আগে কোনদিন দেখেনি গোলাপ। সে তো তাকানো নয়, বিস্ময়, গর্ব ও প্রেমের প্রদীপে যেন বরণ করল, আরতি করল। বিমলির ঈষৎ বিষণ্ণ মুখটা সে-আলোয় অপূর্ব হয়ে উঠল। শীতের একটা বিষণ্ণ পত্রহীন শাখা-সম্বল-গাছ যেন হঠাৎ পাতায় ফুলে ফলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসছে।

বিম্‌লি দেখছিল গোলাপকে। সুদর্শন যুবক। চোখটা ক্লান্ত—বুঝি ঘুম পেয়েছে। বিম্‌লির চোখও জড়িয়ে আসছে। গোলাপ তো তবু দিনের বেলায় ঘুমিয়েছে। বিম্‌লি তিনদিন ধরে তাও পারেনি। চোখের পাতা এক করলে গোলাপ যে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যায়। যদি গোলাপের ঘুম আসে, ঘুমোক সে। বিম্‌লি তার শিয়রে দুটি চোখের দীপ জ্বেলে বাকী রাত জেগে বসে থাকবে।

কত বছর গোলাপ বলতে শুধু একটা নির্বস্তুক ভাব মাত্র ছিল তার কাছে—তার কোন মূর্তি ছিল না বিম্‌লির মনে। আজ যখন সে এল, কত রূপেই না সে এল! যাত্রার আসরটা সজীব হ'য়ে উঠল বিম্‌লির মনে। গোলাপ তো জানে না সীতা-সাজে বিম্‌লি তাকে অনুসরণ করেছে, বনবাসে গিয়ে লব-কুশকে বুকে ক'রে তাকে স্মরণ করেছে, বৃষকেতুর বলিদান-মুহূর্তে বিম্‌লি মনে মনে তার হাত চেপে ধরেছে, চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণে আর্তনাদ করেছে। বিচিত্র রূপে সে দেখা দিয়েছে, তার সকল রূপের অনুসরণ করেছে বিম্‌লি। সেই বিভিন্ন সত্তার আবেগ হঠাৎ ঘনীভূত হ'য়ে এলো তার একটা বুকে, সকল চরিত্রের নিশ্বাস সে একা গ্রহণ করছিল, সকল চোখের জল আসছিল তার একার দুটি মাত্র চোখে।

গোলাপ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁদছ।'

এই সামান্য কথাতেই বিম্‌লির আবেগ উদ্বেল হ'য়ে উঠল। মাথাটা গোলাপের বুকে গুঁজে সে হু-হু ক'রে কাঁদতে লাগল।

গোলাপ দু'হাতে ধরল তাকে, ভালো করে বসাল। বলল, 'কাঁদছ কেন?'

জবাব দিল না বিম্‌লি। কিছুক্ষণ কাঁদবার পর সে একটু শান্ত হ'ল।

'তুমি কাল চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।' একটু থেমে যোগ করল গোলাপ, 'যেতে যে হবেই।'

'কালই?'

'হ্যাঁ। দল যে কাল চলে যাচ্ছে।'

একটু চুপ করে রইল বিম্‌লি, তারপরে বলল, 'আবার কবে আসবে?'

সঠিক জবাব খুঁজে পেল না গোলাপ। এলোমেলো চিন্তা করতে করতেই বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না।' আবার একবার থেমে যোগ করল, 'আসবো শীগ্‌গিরই। দিন ঠিক ক'রে বলতে পারছি না। বুঝতেই পারছ যাত্রা দলের ব্যাপার—'

'এখন কোথায় যাবে? কোলকাতায়?'

'হ্যাঁ। দল যাবে।'

ধীরে ধীরে থেমে থেমে প্রশ্ন করতে লাগল বিমলি। গোলাপ যে তার কাছে একদম অজানা। সে জানতে চায় তাকে ভালো ক'রে। তার প্রাত্যহিক কর্মসূচীর কোন অংশই বিমলির কাছে তুচ্ছ নয়।

'কোলকাতায় তুমি কোথায় থাকো? মেসে?'

'মেসে—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। একটা ঘর নিয়ে থাকি আমরা—বসন্তও থাকে।'

'খাও কোথায়?'

'কোনদিন হোটেলে, কোনদিন রান্না ক'রে।' সহজ হবার চেষ্টায় বেশ চটপট উত্তর দিল গোলাপ। আসলে বসন্তর জীবনযাত্রাটা এমনি। গোলাপ নিজেকে বসন্তর অন্যতম ঘরবাসী হিসেবে পরিচয়টা দিয়ে গেল।

'ও, সেইজন্যই বসন্তবাবু অত ভালো রান্না করতে পারেন।'

'হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি পারি না।' হেসে বলল গোলাপ।

'খাওয়ার কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট? কিসের? বেশীর-ভাগ দিনই তো থাকি বাইরে।'

'গাঁ থেকে চলে আসবার পর ববাবর এইরকম ক'রে কাটাচ্ছো?'

'না—হ্যাঁ—প্রায় এইরকমই, তবে রকমফের আছে বৈকি।'

কতদূর যাওয়া সঠিক হবে বুঝতে পারছিল না বিমলি। গোলাপ বিরক্ত হচ্ছিল কিনা বারবার ভাবছিল! বেশ ইতস্তত করেই জিজ্ঞেস করল, 'কোলকাতায় নিয়ে যাবে না আমায়?'

'এখন—ইয়ে—তা সম্ভব নয়। পরে নিয়ে যাব। একটু গুছিয়ে নি, একটা বাড়ী-টাড়ী দেখে নি—'

'না, না, পরেই। এক্ষুনি নয়।'

'ভাবছি, যাত্রাদলের কাজ তো, বাইরে বাইরে থাকতে হয়, একা একা তোমার কোলকাতায় থাকা—'

'সে আমার অসুবিধে হবে না। আমি পারব।'

'আচ্ছা, দেখি গিয়ে।'

'ঠিকানা আমায় দিয়ে যাবে না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' বসন্তর ঠিকানাটা দেয় গোলাপ।

'তোমার ঘুম পাচ্ছে, না? শুয়ে পড়। পর পর কত দিন রাত-জাগা গেল?'

'তুমি শোবে না ?'

বিম্‌লি গোলাপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি না-হয় না ঘুমোলুম।'

'সেকি।' আশ্চর্য হ'ল গোলাপ।

'তুমি শোও।' গভীর হয়ে এল বিম্‌লির চোখ। 'আমি হাওয়া করছি তোমায়—বড় গরম আজ।'

'না, না।' তীব্র আপত্তি জানাল গোলাপ। 'আমার তাহ'লে ঘুমই আসবে না। ওসব একেবারেই অভ্যেস নেই যে।'

বিম্‌লি বসেই রইল। চোখে তার সেই গভীর দৃষ্টি—একটু বিষণ্ণও।

'শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।'

পরদিন কলকাতার উদ্দেশে বেরবার সময় নিরু বলল, 'ঠাকুরপো, আবার কবে আসছ বল। আমাদের ভুলে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু বিম্‌লিকে আর ভুলতে পাবে না।'

গোলাপ হেসে বলল, 'আসব শীগ্‌গিরই।'

সোনা বলল, নিরুর কথার সূত্র ধরে, 'বৌদিকে ভুললে ক্ষতি নেই, কিন্তু গোলাপদা তুমি আমায় ভুলতে পাবে না।'

হাসল গোলাপ : 'কেন রে ?'

'বা রে, আমি যে কোলকাতা যাব।'

'কোলকাতা ? কী সর্বনাশ ! কেন ?'

'কত কী সব দেখবার আছে, দেখতাম বেশ। গোলাপদা, নিয়ে যাবে আমাকে ? সত্যি, নিয়ে চল না। রেঁধেও দিতে পারব তোমায়। হাত-পা পুড়িয়ে রেঁধে তো খাও শুনলাম। তোমার ঐ রাঁধুনি বামুন শ্যামলী-ধবলীর চেয়ে ভালোই রাঁধব।'

'বেশ তো, যাস। কিন্তু এখন নয়, পরে।'

'পরে ? কখন ?'

'দেখি তো। আজই কি ক'রে তারিখটা বলি ?'

'আচ্ছা, মনে থাকে যেন।'

'থাকবে রে, থাকবে।'

'না থাকলে কিন্তু, হ্যাঁ, আমায় চেনো না।'

'ওরে বাবা, বলিস কি রে, তোকে চিনি না ?'

'ঘোড়ার-ডিম চেন! সব ওদের মুখে শুনে চিনেছ তো?'

'যদি তাই শুনে থাকি—?'

'ওরা মিথ্যে বলে।'

গোলাপ হেসে বলল, 'বেশ, একদিন না হয় তোর মুখ থেকেই শোনা যাবে সত্যি কথাটা।'

'তাহ'লে আমায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'যাব।'

'না নিয়ে গেলে নিজেই একদিন গিয়ে হাজির হব।'

'খবরদার তা করিস না, নিজেই মুশকিলে পড়বি। গিয়ে দেখবি, আমরা হয়তো চলে গেছি—আসাম।'

চোখটা হেসে উঠল সোনার: 'মেজবৌদির কাছ থেকে খবর নিয়ে যাব।'

নিরু বলল, 'বসন্তবাবু, আপনাকে আর নেমন্তন্ন করারও দরকার নেই নিশ্চয়ই। আপনি এখন আমাদের বাড়ীরই লোক। সময় পেলেই হাত-পা পুড়িয়ে রান্না করা বন্ধ রেখে এখানে চলে আসবেন, সোনার হাতের রান্না খেয়ে যাবেন।'

হাসল নিরু, তাকাল বাঁকা চোখে সোনার দিকে।

সোনা ঠোঁট উল্‌টে বলল, 'বয়ে গেছে আমার!'

বসন্ত বলল, 'বৌদি, আশীর্বাদ করুন, হাত-পা পোড়ানোর চাকরীটা যেন বজায় থাকে। ও চাকরীটাও যে দেখছি যাবার দাখিল—ওখানেও উমেদার জুটেছে।'

সারাটা বিদায়-দৃশ্যে বিন্দু আর বিম্‌লি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

কোলকাতা গোলাপের কাছে মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কোলকাতায় ফিরে সে-ভ্রান্তি ঘুচে গেল।

সাগরীর কাছে তার একটা ভয়-ভয় ভাব ও অপরাধী মনোভাব বিয়ের সময় থেকে বরাবরই ছিল। এখন সেটা হঠাৎ খুব বেড়ে উঠল।

সাগরীকে বুকে চেপে ধরেও তার মনে হয়, সাগরী তার জীবনে নেই, বুঝি সে কোন্ সুদূরে চলে যাচ্ছে, গোলাপ কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারছে না।

সাগরী গোলাপের সূক্ষ্ম ভাবান্তর অনুভব করে, কিন্তু ভাবান্তরের কারণটা

খুঁজে পায় না। দুশ্চিন্তা বাড়ে, কষ্ট পায়, কিন্তু করণীয় নেই কিছু তার। শুধু মনের মধ্যে অসহায় হাহাকার তীব্রতর হয়।

মাঝে মাঝে গোলাপ খুব স্ফূর্তি করে, খুশী হ'য়ে ওঠে, অর্থাৎ খুশীর ভান করে। সাগরী অনেকসময়ই বুঝতে পারে না ভানটুকু। ভাবে, গোলাপের মাথা থেকে বুঝি ভূত নামল।

কিন্তু ভূত বেশীক্ষণ নেমে থাকে না, আবার এসে চাপে।

ভূতগ্রস্ত গোলাপ রুনু-ঝুনুকে নিয়ে আজকাল বেড়াতে বেরোতেও ভয় পায়। খালি মনে হয়, এই বোধহয় কেউ দেখে ফেলল—পূর্ণদের কেউ। পথচারীদের সাধারণ দৃষ্টিকেও সে অন্যরকম মনে ক'রে ভয় পায়। তাড়াতাড়ি রুনু-ঝুনুকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

সাগরী জিজ্ঞেস করে, 'তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?'

'এমনি।' তাড়াতাড়িতে একটা অজুহাত বানাতে পারে না।

প্রতি মুহূর্তে ভয় হয়, পূর্ণ সদলবলে হঠাৎ কোলকাতায় না এসে হাজির হয়। যত দিন যায়, তত ভয়টা ক্রমাগত বাড়ে। অথচ বসন্তর ঠিকানাটা অন্তত না দিয়ে উপায় ছিল না। না দিলে, পূর্ণ দাসের 'বঙ্গ অপেরা' মারফত খোঁজ ক'রে সটান বাড়ীতে এসে একদিন উঠত।

প্রতি পদশব্দে সে আতঙ্কিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করে, 'সাগর, কে এল?'

হয়তো ভবন-দাদু, বা ছোটবৌ, কিংবা রুনু-ঝুনু, অথবা সাগরী নিজেই।

গোলাপের আতঙ্কটা সাগরীর চোখ এড়ায় না; বলে, 'কারুর আসবার কথা ছিল নাকি?'

'না, মানে, ভাবছিলাম—বসন্ত।'

'বসন্‌দার জন্য ভয় পাচ্ছো কেন তুমি?'

গোলাপ তাড়াতাড়ি সামলাবার চেষ্টা করে, 'না, ভয় কিসের?' সাগরীর দিকে তাকিয়ে দেখে সে কথাটা মানতে পারছে না। 'অবিশ্যি ভয় বলতেও পারো। জানো, সাগর, আমার আর এ কাজ ভালো লাগছে না, এ আমি আর করতে পারব না।'

'অন্য একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা ছাখো তবে। তোমার শরীরও খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, দেখব।...বাইরে কে এল?'

রুনু এসে ঘরে ঢোকে। বাবার গা ঘেঁসে এসে বলে, 'বাবা, আমাদের আর তুমি বেড়াতে নিয়ে যাও না কেন?'

'যাব রে, যাব। আমি তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছি না।' হঠাৎ একটু চটেই ওঠে গোলাপ।

সাগরী রাগের কারণ খুঁজে পায় না।

গোলাপও বোঝে, অদ্ভুত হচ্ছে তার ব্যবহার। বলে, 'আচ্ছা আমি একটু ঘুরে আসছি।'

গোলাপ সটান চলে আসে বসন্তর কাছে: 'আজ রাতের ট্রেনে বহরমপুর যাব। নইলে হয়তো ওরা কেউ এসে পড়বে।'

ফিরে এসে সাগরীকে বলে, 'পালা আছে, আজ রাতেই বেরোতে হবে—এই খবর পেলুম।'

গোলাপ বসন্তকে নিয়ে চলে আসে বহরমপুরে। গোলাপ পালা গাইতে যাবে আর বসন্ত কোলকাতায় পড়ে থাকবে, এটা স্বাভাবিক নয়, তাতে সাগরীর নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে দু'বন্ধুকেই। তা ছাড়া, বসন্ত সঙ্গে থাকলে গোলাপ একটু ভরসা পায়। আর সে যে কোন অন্যায় করছে না তা অন্তত একটা লোক জানুক, সকল কিছুর সাক্ষী থাক্ সে, যেন জীবনের শেষ বিচারে অন্তত একটা মানুষও তার ক্ষত-বিক্ষত বিবেকের পাশে এসে দাঁড়ায়।

বহরমপুরেও শান্তি নেই। শান্তি তার জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিম্‌লির মুখে হাসি ফোটে। যতই দিন যাচ্ছিল, ততই সে গোলাপের পুনরাগমন সম্পর্কে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিল। ঘর-পোড়া গরু সে, প্রতিটি দিন তার কাছে আশঙ্কার বাণী শোনাচ্ছিল। আবার হয়তো সেই আগের জীবন—শুধু মধ্যের কয়েকটা দিনের অদ্ভুত একটা স্বপ্ন শূন্যতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে মাত্র, আর জীবনকে শূন্যতর করবে।

কিন্তু সেই স্বপ্ন-দ্বীপ আবার বাস্তব হ'য়ে দেখা দিল। আর কোন আশঙ্কা নয়, লজ্জা নয়, সংকোচ নয়, গোলাপকে ঘিরে তার জীবনের যত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা সব বিপুল শক্তিতে তরঙ্গিত হ'তে লাগল। কোন কূলের বাঁধন তাকে সংযত রাখতে পারবে না। দেহের সব ক'টি স্নায়ু উদ্দাম সুরে ঝংকৃত হ'ল, রক্তের প্রতিটি কণিকা তীব্র স্রোতের পথে দিশাহারা হ'য়ে ছুটতে লাগল।

সেই তরঙ্গবেগের শক্তির কাছে গোলাপ অত্যন্ত দুর্বল। পনেরো-ষোল বছর ধরে গোলাপকে কেন্দ্র ক'রে যত তৃষ্ণা বিম্‌লির যৌবনে আকণ্ঠ জমে উঠেছিল, তার থেকে নিস্তার ছিল না গোলাপের।

গোলাপ দেখল, কাটা কই-মাছের মতো ভাজার কড়াই থেকে লাফিয়ে

সে উনুনের মধ্যে পড়েছে। এবার আবার কোলকাতার জন্যে সে ছটফট্
করতে লাগল।

বেরোবার মুখে সোনা তার পুরোনো দাবী আবার পেশ করল, 'আমি
কোলকাতা যাব।'

'যাবি রে, যাবি। আমি তো আর পালাচ্ছি না।'

গোলাপরা ফিরে আসে কোলকাতায়।

সাগরীর পালকের মতো হালকা দেহটা দু'হাতের মধ্যে নিয়ে একটু শান্তি
পায় গোলাপ। পাখীর মতো নরম সাগরীর দেহটাকে পিষে নিজের দেহের
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, স্বতন্ত্র দুটো সত্তা যে
তারা—দেহে-মনে বহু ব্যবধান।

সাগরী উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছো?'

'খুব ভালো, সাগর, খুব ভালো।'

'তবে অমন করছ কেন?'

'তোমাকে পেয়ে।'

'আমায় কি নতুন পাচ্ছো নাকি?'

'হ্যাঁ, নতুন, একেবারে নতুন।'

'ছাড়ো। তিন ছেলের মা বুড়ীকে অমন আদর করতে হবে না।'

'না, হবে।'

'তুমি মাঝে মাঝে কি রকম হ'য়ে যাও যেন।' গোলাপের চুলের মধ্যে
আঙুল চালাতে চালাতে বলে সাগরী।

'সত্যি। জানি আমি।'

'কেন? আমায় বলবে না?'

'তোমায় না বলবার আমার কী আছে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হ'ল
গোলাপ। 'কিন্তু আমি নিজেই বুঝি না, সাগর, তোমায় বলব কি?'

সাগরী চুপ ক'রে রইল।

গোলাপ বলল, 'মাঝে মাঝে আমার খোকনের কথা মনে হয়, সাগর।'
মিথ্যে ক'রে খোকনের নামটা আনতে হ'ল ব'লে গ্লানি লাগল মনে। কিন্তু
উপায় নেই।

মিথ্যাতে কিছু কাজ হ'ল। সাগরী আরো ঘেঁষে এল গোলাপের দিকে:
'অত ভেবো না তুমি!'

সাগরী নিজের ব্যর্থতায় লজ্জা পেল, কষ্ট পেল। একটা পুত্রসন্তান দিতে পারছে না সে স্বামীকে। স্বামীর অস্থির মনটার জ্বালা মোছবার প্রচেষ্টায় বলল, 'অত ভেবো না, লক্ষ্মীটি। আমাদের কি বয়স গেছে? আবার আসবে সে।'

আর একদিন কথাটা ব'লে সাগর লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল। আজ লজ্জার কথাটা মনে পড়ল না।

কিন্তু গোলাপ ভাবছিল সাগরীর অজ্ঞাত গোপন কথাটি। ঝুনু হবার সময় সাগরী প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিল—জীবন-সংকট প্রায়। ডাক্তার বলেছিলেন, অপারেশন করলে সাগরীর আর নতুন সন্তান-সম্ভাবনার আশা নেই, এই বোধহয় শেষ মাতৃত্বলাভ তার। তিন সন্তানের পিতা গোলাপের তাতে খুব আফসোস ছিল না, তা ছাড়া সেই মুহূর্তে সাগরীর প্রাণই সবচেয়ে বড়। গোলাপের অনুমতি নিয়েই ডাক্তার অপারেশন করেছিল। মা ও সন্তান দুই-ই বাঁচল। ভবিষ্যতের ভাবনার খুব কারণ ছিল না। খোকনের মৃত্যুতে ভাবনাটা শুরু হ'ল। অবশ্য ডাক্তার নিশ্চিত করে বলেন নি কথাটা, সম্ভাবনা খুব কম এইটুকু মাত্র বলেছিলেন। ডাক্তারের কথার মধ্যে যে অতিসূক্ষ্ম আশার আলো ছিল সেটাকে একটু বাড়িয়ে বলেছিল সে সাগরীর কাছে। সাগরী তাকে আরো বাড়িয়ে কল্পনা করে। গোলাপ ভাঙতে চায় না সাগরীর সে-স্বপ্ন।

'সাগরী বলে, 'অত ভেবো না গো।'

কিন্তু গোলাপ না ভেবে পারে না।

'ভাবতে ভাবতে নিজেকে মেরে ফেলছ যে তুমি।'

বহরমপুরে শুধু হাজ্‌রে ও টাকা দিলেই ব্যাপারটা চোকে না। দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী হ'য়ে উঠেছে বিম্‌লি। বহুদিনের ক্ষুধার্ত যৌবন বন্যার বেগে গোলাপকে গ্রাস্ করে। হঠাৎ তীব্রতর জীবন-আসক্তি পেয়ে বসেছে বিম্‌লিকে। সুস্থ বলিষ্ঠ নারীর রক্তের সাধারণ আবেগ, কিন্তু গোলাপ কাঠের মতো আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে।

বিম্‌লি সহস্র মোহিনী-জাল বিস্তার করে, হাস্যে চটুলতায় বিচিত্র এক লাস্যময়ী নারী। দু'দিন আগের মৌখিক বিষণ্ণ ছাপ তিরোহিত হ'য়ে কামনার রসে ঢলঢল হ'য়ে উঠেছে তার মুখ। দেহও নিঃশব্দ বাসনাবেগে গতিময়।

হঠাৎ রাতারাতি বদলে গেছে বিম্‌লি। বহুদিন মনে-মনে যেন প্রস্তুত ছিল সে—বাইরের অবলম্বনের অভাবে শীত-শীর্ণ সাপের মতো বিবরে শায়িত ছিল। হঠাৎ জেগে উঠেছে, মেতে উঠেছে। সাপিনীর খোলস-ছাড়া রূপের মতো মোহময় তারুণ্য বিম্‌লির সারা দেহে ঝিকিয়ে বেড়ায়; চলার তালে দেহের নানা জায়গায় আলো প'ড়ে বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে, সাপিনীর মতো নিঃশব্দ দ্রুত বঙ্কিম পিচ্ছিলতায় বিম্‌লি আসে, সাপিনীর মতোই পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে গোলাপকে, ধীরে ধীরে স্তিমিত ক'রে ফেলে তাকে, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে তার। শিথিল হ'য়ে যায় গোলাপের সারা অঙ্গ সারা চেতনা সেই তৃষিত উদ্ধত যুগ-সঞ্চিত যৌবনের মাদক আক্রমণে। সে-যাহুর ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় গোলাপকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, আবিষ্ট গোলাপকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিম্‌লি বহু দূরে নিয়ে যায়—দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত দিগন্ত পর্যন্ত। গোলাপের সকল ইন্দ্রিয়কে যেন সে অন্ধ ক'রে দেয়, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর রাখে না বিম্‌লি।

তারপর একসময় শিথিল হ'য়ে আসে তার পাকগুলো, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিশ্বাস ফিরে আসে গোলাপের। ফিরে আসে চেতনা, চিন্তা, অনুশোচনা। সবল সুপুষ্ট যৌবনের দৃঢ়-আলিঙ্গন ক্রমে তার গ্রন্থি খোলে, মুক্ত হ'তে থাকে গোলাপ। তার একান্ত পাশে সেই যৌবন নিম্নভাষে সুতৃপ্তির কী এক অস্ফুট মন্ত্র পড়ে, ক্রমে হয় নিঃশব্দ, নিশ্বাসের উত্তেজনা কমে দীর্ঘ ও ঘন হ'য়ে আসে, নিদ্রা যায় সেই অনিন্দিত যৌবন।

গোলাপের তন্দ্রাও আসে না। অতন্দ্র চোখে ছাখে সে সেই নিদ্রিত যৌবনকে। এত কাছ থেকে গোলাপ সাগরী ছাড়া আর কোন নারীর যৌবনকে প্রত্যক্ষ করেনি। আশ্চর্য হ'য়ে তাকায় গোলাপ। এই যৌবনও তার একান্ত নিজস্ব,—তার স্ত্রীর। প্রথমা স্ত্রী—গোলাপের ওপর যার প্রথম ও একক অধিকার। আশ্চর্য, গোলাপ চেনে না তাকে। চিনতে চায় না পর্যন্ত। অথচ সে তার জীবনের মধ্যে ধীর ও নিশ্চিত পদক্ষেপে অনুপ্রবেশ ক'রে যাচ্ছে। সেই নিঃশব্দ-পদসঞ্চারী নিদ্রিত অনিন্দিত যৌবনের দিকে তাকিয়ে লজ্জা হয়, মোহ জাগে, অনুশোচনায় অন্তর পোড়ে, আতঙ্ক হয়।

ভোরের আগে ঘুমিয়ে পড়ে গোলাপ। ঘুম নয়, তন্দ্রা। ভোরে অস্পষ্ট-ভাবেই টের পায়, সেই যৌবন নিজেকে আবরিত করছে শিথিল বসন তুলে। তন্দ্রার মধ্যেই অনুভব করে তৃষিত দুটি চোখের লেহন, স্পর্শ পায় যৌবন-সুন্দর

দুটি ওষ্ঠের। গোলাপের তন্দ্রা টুটে যায়, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে জাগে না, কাঠ হ'য়ে পড়ে থাকে।

যৌবনবতী উঠে দরজার দিকে পা বাড়ায়। গোলাপ অভিনয় শেষ হ'য়েছে ভেবে চোখ খোলে। বিম্‌লির কাপড়ের একটা প্রান্ত গোলাপের পিঠের নিচে আটকে ছিল—সেটাতে টান পড়তেই ঘুরে দাঁড়ায় বিম্‌লি। গোলাপ প্রস্তুত ছিল না এর জন্যে—দুজনে চোখাচোখি হয়। বিম্‌লি দ্রুত হাতে কাপড় টেনে লজ্জা ঢাকে, চোখের কোণে ঈষৎ সলজ্জ অনুরাগের হাসি হেসে বলে, 'অসভ্য!' তারপর হঠাৎ প্রায় ছুটে এসে পড়ে গোলাপের বুকের ওপরে।...তারপরে আবার প্রায় ছুটেই বেরিয়ে যায় বিম্‌লি—পেছনের লুটিয়ে-পড়া আঁচলটা দ্রুত হাতে টেনে নেয়। ভোরের আলো জেগেছে তখন।

এমনি একটা রাত নয়। অনেক নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ রাত। বাইরের ঝিঁঝির ডাকও ঘরে ঢোকে না—নিরু সোনার আড়িপাতার বিরুদ্ধে জানলাগুলো সেঁটে রেখে যায়। ধোঁয়াটে হারিকেনটাও সঙ্গী থাকে না—চোখ বোজে। দুয়ের নির্জন এককতা।

গোলাপদের দাম্পত্য-জীবনের গোপনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার এতটা প্রচেষ্টা নিরুর না থাকলেও চলত, কারণ সোনা এখন এ ব্যাপারে অত্যন্ত নিরুৎসাহ। শুধু এ ব্যাপারেই নয়, সব কিছুতেই।

হঠাৎ একটা ঔদাসীন্য যেন ভর করেছে সোনার ওপর। এটা সোনার মেজাজের পক্ষে অস্বাভাবিক, খাপছাড়া। বাড়ীর লোকেও একটু আশ্চর্য হয়। সোনা যেন বড় নিঝ্‌ঝুম। তার খরধার জিভ সাপের মতো লকলক করে না; যত্র-তত্র দংশন ক'রে সে আনন্দ পেত, এখন নিজেকে সে সে-আনন্দ থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

নিরু দু'একদিন জিজ্ঞেস করেছে, 'কি গো কচু-সোনা, এত চুপচাপ কেন?'

সোনা চটে গেছে: 'তবে কি গলা ফাটিয়ে চেল্লাচেল্লি করতে হবে?'

বিন্দু বলে, 'বৌদি, ঝড়ের আগে আকাশ নিঝ্‌ঝুম মেরেই থাকে। মুখটা গ্যাখো না, ঈশানে মেঘ করেছে।'

বসন্তকে খোঁচা মেরে বিক্ষত করতে সোনার বিশেষ উৎসাহ ছিল। এখন সে-সম্পর্কেও সোনা উদাসীন। বাড়ীর কথাবার্তায় সে প্রায় যোগই দেয় না।

বসন্ত হয়তো তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী

ব'লে সকলকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে, তখন হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে থেকে উঠে যায় সোনা, হয়তো একা গিয়ে শুয়ে থাকে।

নিরু ভাবে, হয়তো তাহ'লে সোনা এতদিনে একটু সভ্য-ভব্য হ'য়ে উঠল। ভালো।

এতদিন বসন্তকে গালাগাল করতে করতেও তার আতিথেয়তার দায়িত্ব ছিল প্রায় সোনার ওপরেই। নিরুকে বাচ্ছা ও সংসারের ঝামেলা পোয়াতে হয়। আর বিন্দুর সংকোচ বেশী। সোনা বরং আগে বিন্দুকে বসন্তর সামনে ঠেলাঠেলি ক'রে পাঠাবার চেষ্টা করলে বিন্দু ভয় পেত, সোনার মজা লাগত। জলের গ্লাসটাও একা বিন্দু বসন্তর সামনে রেখে আসতে পারতো না। বিন্দুর কেমন ভয় ছিল, তার আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকা দেহটা বসন্তর সামনে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে অতি-স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে পুরুষের দৃষ্টির আলোয়।

সেই বিন্দুর হাতেই আজকাল বসন্তর আতিথেয়তার দায়িত্ব পড়ে বাধ্য হ'য়ে—সোনার বাড়ীতে থেকেও না থাকার ফলে। বিন্দুর সংকোচ অবশ্য এখন কমেছে অনেকটা, তবে একেবারে যায়নি, সেটা যাবার নয়। রাতে খাবার পাট চোকবার পর বসন্তর শিয়রে এক গ্লাস জল রেখে আসতে এখনও একটু কাঁপুনি লাগে বিন্দুর বুকে। তবু অবশ্য বসন্তর থাকাকালীন রোজ রাতেই যেতে হয় বিন্দুর। এটাই রাতে তার শেষ কাজ।

একদিন এই কাজটি সেরে শুতে এসেছে, হঠাৎ সোনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় গিছলি রে মেজদি ?'

সোনার গলাতেই বিন্দু তার মেজাজের আভাস পায়। বলে, 'কারুর মনের আগুন উস্‌কে দেবার জন্যে নয়।'

এমন বাঁকাভাবে বিন্দু সাধারণত কথা বলে না। কিন্তু সোনার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ইঙ্গিত ছিল, যেটার অপমানকর জ্বালায় কথাটা তার মুখ দিয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল।

সোনার গলা সাপের মতো হিসিয়ে উঠল: 'ইস্! সত্যি ? মাইরি ? তবে বুঝি নিজের মনের আগুন একটু উস্‌কে নেবার জন্যে গিছলি ?'

বিন্দুর যেখানে ব্যথা, সেখানেই ঘা দেয় সোনা। বিন্দুর চোখ জ্বালা ক'রে কান্না আসে। বলে, 'সোনা, আইবুড়ো বুড়ীর মন ব'লে কিছু থাকে না, অনেক আগেই পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।'

'হুঁ, তাই বুঝি যখন-তখন লজ্জায় ভেঙে পড়িস ? বারোহাত কাপড়েও এঁটে উঠতে পারিস না ?'

কান্নায় ভেঙে পড়ে বিন্দু : 'সোনা, তোর পায়ে পড়ি, থাম্ তুই। জানি আমি আইবুড়ো মেয়ে, সময়কালে বিয়ে হয়নি, মুটিয়ে ধুমসী হয়েছি, জানি আমি খারাপ দেখতে, জানি আমার লজ্জা বেশী, জানি আমার কোনকালে বিয়ে হবে না। নিজের জ্বালায় সারা জীবন জ্বলে মরছি, তুই আর বিষ ঢালিস না!'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে বিন্দু। ব্যর্থ অনাঘ্রাত যৌবন অপমানের জ্বালায় কাঁদে। ভাবে, যদি সে নির্লজ্জ হ'তে পারতো, তবে একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডে দেহটাকে ঝলসে দিয়ে উল্‌টো কথাটা প্রমাণ করত, প্রতিশোধ নিত। কিন্তু তার লজ্জা তাকে বেঁধে রেখেছে। নইলে সোনার কথাগুলোব সমুচিত জবাব দিত সে।

রাত বাড়তে থাকে। রাগটা ক্রমে শ্বাসরোধী একটা কষ্টে পরিণত হয়—মায়ের পেটের বোনের কাছেও এমন কথা শুনতে হয়! দুঃখে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায় তার মন। কেঁদেও হালকা হয় না। এ ভার বহন করতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। জীবনটাকে ভারবাহী জন্তুর মতো শুধুমাত্র সহ্য করে যেতে হবে তার।

সোনা বুঝতে পারেনি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। কোনকালেই ভেবেচিন্তে কথা বলা তার ধাতে পোষায় না। বিন্দুর ব্যবহারে প্রথমটা সে একটু হতভম্ব হ'য়ে যায়। তারপর কান্নাটা কমতে সোনা পাশ ফিরে শোয়। ঘুমোতে চেষ্টা করে—মেজদি কাঁদছে না এখন, থেমেছে কান্নাটা, অন্তত শোনা যাচ্ছে না, তাহ'লেই হ'ল।

গোলাপের স্বাস্থ্যটা ভেঙে পড়তে থাকে। মেজাজ হয় একটু রুক্ষ।

সাগরী বলে, 'দিন দিন এ কী চেহারা হচ্ছে তোমার!'

'রাত-জাগার কাজ—' অজুহাত খোঁজে গোলাপ—যেন এতদিন তার এ কাজ ছিল না।

'এত কাজ নাও কেন? দুটো একটা তো তুমি ছাড়তেও পারো।'

'টাকা আসবে কোথা থেকে?'

'টাকার দরকার নেই। মানুষের শরীরটা বড়, না টাকা বড়?···আর টাকাই বা কোথায়? যত রাত তোমার কাজ পড়ে, ততটা তো দেখি না।'

হঠাৎ চটে ওঠে গোলাপ : 'দেখছো না তো, বেশ! এই গুষ্টির গেলা-টা আসছে কোথা থেকে? দূর শালা, বলে—যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর!'

সাগরী আশ্চর্য হয়, ব্যথিত হয়: 'তুমি চটছ কেন? আমি কী এমন বলেছি—?'

'কী না বলেছ? না-হয় তোমার একটা দুল বিক্রী করেছি—কী হয়েছে তাতে। গড়িয়েও দিয়েছিলাম তো আমি, তোমার বাপ তো দেয়নি। আবার না-হয় গড়িয়ে দোব। গয়নার শোকে একেবারে গেলে যে!'

'ওগো, অমন ক'রে বোলো না! ও-কথা শুনলেও নিজের ওপর ঘেন্না হয়। আমি কি তোমায় দুলের কথা বলেছি? তোমার শরীর ভেঙে গেলে কি হবে আমার দুলে? ভেবেছিলুম এটা বেচছ বুঝি তোমার ওষুধ-বিষুধ কেনবার জন্যে, কিন্তু টাকাটা কী যে করলে তুমিই জান।'

'আমার টাকা আমি যা খুশী করেছি, তাতে কার কী বলবার আছে? দূর শালা, বাড়ীতে আসে মানুষ দু'দণ্ড শান্তির জন্যে, আর আমার—'

বেরিয়ে পড়ল গোলাপ।

মনটা তার অনুশোচনায় পুড়তে লাগল। আজকাল মেজাজটা ঠিক রাখতে পারে না গোলাপ।

যাতায়াতের খরচা ছাড়াও বিমলিকে আজকাল কিছু টাকা দিতে হয়—ফলে টানাটানি না পড়ে উপায় থাকে না। এদিকে কোলকাতার বাইরে কিছুটা সময় কাটাবার ফলে দুটো-একটা কাজ হাত ফস্কায়। কিন্তু সাগরী জানে ক'টা রাত গোলাপ বাইরে কাটায়, এবং কী তার রেট। তাতে আয়ের অঙ্ক সাগরীর কাছে স্ফীত হয়ে দেখা দেয়, অথচ আসলে আয় কম। সংসারে দুজনের দুটো হিসেব—অতএব ঠোকাঠুকি অনিবার্য। ঠোকাঠুকিটা মারাত্মক বিপর্যয়ে পৌঁছোবার কথা। কিন্তু সাগরী অসীম ধৈর্যে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। তবু একেবারে এড়ানো যায় না।

আর্থিক ঘাটতি মেটাবার জন্যেই গোলাপকে সাগরীর কাছে হাত পাততে হ'য়েছে। সাগরী গোলাপের স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিল; ভেবেছিল টাকাটা ঐ খাতেই ব্যয় হবে, কিন্তু তা হয়নি, কিসে খরচা হ'ল তাও জানে না। সাগরীর দোষ নেই, জানে গোলাপ। মেয়েটা চুপ ক'রে থাকে—বড় বেশী ধৈর্য মেয়েটার। মেয়েটা কেন চীৎকার ক'রে গোলাপের রাশ টানবার চেষ্টা করে না? তাহ'লে গোলাপও একটু চীৎকার ক'রে মনের বোঝাটা হালকা করতে পারত। মেয়েটা সে সুযোগ দেয় না।

কিন্তু একটা দুলে আর ক'দিন? নৌকোর তলাটা যে ফুটো—এভ সামলানো যাবে কেমন ক'রে? দু'নৌকায় পা দিয়ে আর চলছে না।

গোলাপ উপায় খুঁজে পায় না, আর মেজাজ খারাপ হয়। অকারণে রাগে, মেয়েগুলোকে গালাগালি দেয়, মারধোর করে! সাগরী আড়ালে চোখের জল ফেলে। স্বামীর পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পায় না। অসহায়ভাবে হাতড়ায়, অসীম ধৈর্যে প্রত্যাশা করে, একদিন সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সাগরীর ক্ষমা ও ধৈর্যের পাশে নিজের অপরাধটা আরো বড় মনে হয় গোলাপের।

একটু বাদেই ফিরল গোলাপ: 'সাগর, আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! আমি আর পারছি না!'

'কী পারছো না তুমি?'

'এ চাকরী আর আমি করতে পারব না। ছেড়ে দেবো শালার এ কাজ। এ বাড়ীটাও আমার ভালো লাগছে না। আমি একটা অন্য কাজ নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবো, সাগর—অ্যাঁ, কি বলো, তুমি রাজি তো?'

'বেশ, তাই চল।'

অসহায়ভাবে বলে গোলাপ: 'যাবো তো ভাবি, কিন্তু কোথায় যাবো। ছোটবেলা থেকে এই লাইনে, এখন অন্য লাইনে লোকে চাকরী দেবে কেন?'

'দেবে, তুমি চেষ্টা করো।'

'সাগর, থিয়েটারে আমায় নেবে না? তোমার কি মনে হয়? চেহারাটা অবিশ্যি আগের থেকে খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। আর গলাটাও—রাতভোর চেল্লালে কি আর শালা গলা থাকে?'

থিয়েটারের দরজায় দরজায় ঘুরল গোলাপ। ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে ফিরল। যাত্রাদলের লোক থিয়েটার করবে? হাসির কথা। থিয়েটার-কর্তৃপক্ষকে হাসিয়ে, নিজে কেঁদে বাড়ী ফিরেছে সে।

সাগরী ওকে সান্ত্বনা দিতে গেছে।

গোলাপ তিরিক্ষে হ'য়ে উঠেছে: 'থাক্, থাক্, আদরে কাজ নেই এখন। তুমিই তো পাঠালে আমায় থিয়েটারের ছোটলোকদের কাছে। শালারা ভদ্দরলোকের মতো কথা বলতে শেখেনি এখনও।'

সাগরী আড়ালে চোখের জল মোছে। গোলাপকে সে ইচ্ছে ক'রে অপমানের জায়গায় পাঠাবে—এ কথা কী ক'রে ভাবল গোলাপ?

রুনু এসে কাঁদুনির সুরে বলে, 'বাবা, মাঠে বাড়ী হচ্ছে, আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। কোথায় খেলব?'

'কোথায় খেলবি তা আমি কি জানি?' খিঁচিয়ে ওঠে গোলাপ, 'আমি কি মাঠ গড়াব?'

ভীত চোখে সরে যায় রুনু।

সাগরী আর্তস্বরে প্রশ্ন করে, 'ওগো, কী হয়েছে তোমার ?'

'কিছু হয়নি।'

'এখন আবার কোথায় বেরোচ্ছ ?'

'অন্য চাকরীর চেষ্টা করব। শরৎ একটা কারখানায় কাজ করে, ওখানে—' বেরিয়ে পড়ল গোলাপ।

একা দাঁড়িয়ে রইল সাগরী ঘরের জানালাটার সামনে। রুনু ঠিকই বলেছে, মাঠে বাড়ী হচ্ছে। 'হাঁইয়া—হাঁ-হাঁ' শব্দে মজুররা ভিত তৈরী করছে। এই একটা পথে সাগরীর ঘরে একটু আলো আসে—দেওয়াল উঠলে সেটুকুও বন্ধ হবে, অন্ধ হ'য়ে পড়বে সাগরী।

হঠাৎ একদিন বসন্তর ঠিকানায় গোলাপের নামে চিঠি এল। বিম্‌লি লিখেছে: 'শীগ্‌গির এসো। দারুণ দরকার।'

গোলাপ বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। অথচ দেরী করতেও ভরসা পেল না।

সাগরীর আর একটা দুল চিরতরে গেল স্যাকরাবাড়ী।

গোলাপ এসে পৌঁছল বহরমপুরে!

'কী খবর ?'

বিম্‌লি লজ্জায় লাল হ'য়ে বলল, 'কিছু না।'

রাগ হচ্ছিল গোলাপের। বিম্‌লির এই ন্যাকামিটুকুর জন্যে তাকে মূল্য দিতে হ'য়েছে অনেক।

বিম্‌লি বলল, 'তোমার শরীর দিন-দিন কি রকম খারাপ হচ্ছে দেখছ ?'

'হোক্‌গে, ডাকলে কেন বলো।'

গোলাপের চোখে চোখ রাখল বিম্‌লি—মুহূর্তের জন্যে। চোখটা সরিয়ে নিয়ে একটু হাসল: 'ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে এসেছ যেন!'

'পুরুষমানুষকে কাজকর্ম ক'রে খেতে হয়।'

'সত্যি, তুমি কেন এখানেই একটা চাকরী-বাকরী দেখে নাও না? সব সময় থাকো বাইরে বাইরে—আমার ভালো লাগে না।'

চুপ ক'রে রইল গোলাপ। আশ্চর্য, বিম্‌লির কথায় সে সাগরীর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। দুজনেই ঠিক-ঠিক স্ত্রীর মতো কথা বলছে। কিন্তু একজনকে ছাড়তেই হবে।

অনেকক্ষণ বাদে গোলাপের বুকের মধ্যে মিশে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বিম্‌লি জানাল, সে মা হ'তে চলেছে।

নতুন পিতৃত্বের সংবাদে গোলাপের একটু ভয় যে না হ'ল এমন নয়। কিন্তু মুহূর্তে তার মন একটা আবেগে আলোড়িত হ'য়ে তাকে নিয়ে গেল অনেক দূরে—দু'এক মিনিটের জন্যে সে বাস্তবের রাজ্য থেকে সরে গেল।

খোকনের কথা মনে পড়ল। খোকন কি এই তির্যক পথে ফিরে এল? সাগরী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সে আসবে। সে হয়তো এল। হঠাৎ একটা নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মাল তার যে বিম্‌লির ছেলেই হবে, মেয়ে নয়। খোকন আসছে।

পরম আদরে বিম্‌লিকে টেনে নিল গোলাপ। নিঃশব্দে সে অনুভব করতে লাগল বিম্‌লিকে। বহুদিন তারা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সময় কাটিয়েছে। কিন্তু এত গভীরভাবে গোলাপ তাকে কোনদিন নেয় নি। এতদিন চায়ওনি। গোলাপের মনের ওপর দিকে বিম্‌লির আশ্রয় ছিল, আজ সে দৃঢ় পদক্ষেপে গভীর মহলে প্রবেশ করল।

গোলাপ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন নতুন ক'রে দেখছিল বিম্‌লিকে। সুন্দর বিম্‌লির মুখটা—গোলাপের মনে হ'ল। আজ ভালো ক'রে সেজেছে। চোখের কোলে গভীর কাজলরেখায় দৃষ্টিটি স্নিগ্ধ, প্রসন্ন—বুঝি একটু সজলও। উদ্ধত উন্মত্ত যৌবনেই বিম্‌লি নিঃশেষ নয়, আরো পরিচয় আছে তার। বিচিত্ররূপে বিম্‌লি ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছে গোলাপের সামনে।

সন্তান আসবার পর আরও কত রূপে বিম্‌লি দেখা দেবে! সন্তান-সহ বিম্‌লির অসংখ্য চিত্র গোলাপের মনের বাতায়নে জড়ো হ'ল। এর পরের বার গোলাপ এলে কত পরিবর্তন দেখবে। রোজই বদলাবে বিম্‌লি, রোজই নতুন হবে।

গভীর দুটি কালো চোখে জল টলটল করছে; বিম্‌লি বলল, 'আর আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না!' জড়িয়ে ধরল সে গোলাপকে।

প্রথম আবেগটা কেটে এইবার ধীরে ধীরে ভয়টা বড় হ'য়ে উঠছিল গোলাপের মনে। ক্রমাগতই জড়িয়ে পড়ছে সে—পাকের পর পাক। বিম্‌লির আলিঙ্গনের মধ্যেও সাগরীর কথা মনে পড়ল তার।

গোলাপ কোলকাতায় ফিরতে, বসন্ত জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, এত জরুরী তলব যে?'

'কিছু না, এমনি। মেয়েছেলের কাণ্ড। শরীর-মন খারাপ, ব্যস্, হুঁঃ!'

গোলাপ বসন্তর প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেল। এই প্রথম সে অনুভব করল, বসন্তকেও সে ভয় করতে সুরু করেছে। তার বিশ্বাসঘাতকতার দলিল রচিত হ'য়েছে বিমলির গর্ভে, নিজের সন্তানের আসন্ন আবির্ভাবের সংবাদটা দিতে পারল না সে বসন্তকে। এই প্রথম সে বসন্তর কাছেও নিজেকে গোপন করল। এতদিন দুজন ঘনিষ্ঠতম নারীর সঙ্গে অভিনয় করছিল যাত্রাদলের নায়ক, আজ থেকে ঘনিষ্ঠতম পুরুষটির সঙ্গেও সুরু হ'ল সত্য গোপন করবার অভিনয়। এ অভিনয় করতে হচ্ছে ব'লে কষ্ট হচ্ছিল গোলাপের—যেন বসন্তর সঙ্গেও একটা বিচ্ছেদ ঘটছে তার।

এর পর থেকে বহরমপুরে বসন্তকে বাদ দিয়েই যায় গোলাপ; ভাবটা, যেন খরচ কমাবার চেষ্টা করছে। যে ক'দিনই হোক, বসন্তের কাছ থেকে তার অপরাধের সংবাদটা গোপন থাক্, আসলে এইটাই সে চায়। অন্তত আর একটু ভালো ক'রে ভেবে নিতে চায় গোলাপ বসন্তকে বলবার আগে। ভাবেও সে, কিন্তু ভেবে কোন কূলকিনারা পায় না।

গোলাপ বদলে যাচ্ছে, মনে হয় বসন্তর। তবু বসন্তর সহানুভূতি আছে তার জন্যে; সে জানে, গোলাপের মনের ওপর বিরাট ধকল যাচ্ছে।

বহরমপুরের জগতে অনুপস্থিত থাকতে লাগল বসন্ত।

নিরু গোলাপকে জিজ্ঞেস করেছে দু'একবার।

গোলাপ কাজকর্মের ও খরচের অজুহাত দেখিয়েছে।

বিম্‌লি এতদিন উদ্বাস্তুদের স্থানীয় কোন শিল্প-শিক্ষালয়ে কিছু হাতের কাজ শিখছিল। পূর্ণ ভর্তি ক'রে দিয়েছিল—গোলাপ তখনও বিম্‌লির জীবনে ফিরে আসেনি। পূর্ণর পরিকল্পনা ছিল বিম্‌লিকে স্বাবলম্বী ক'রে তুলবে।

গোলাপ একদিন বলে, 'বিম্‌লি, ওটা এখন কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দাও, তোমার শরীরের এখন—'

স্বামী তার সম্পর্কে এতটা ভাবছে দেখে খুব খুশী হয় বিম্‌লি, কিন্তু বলে, 'না।'

'কেন?'

'শেখা হ'য়ে গেলে চটপট একটা চাকরী যোগাড় করতে হবে আমায়।'

'কেন?'

'তোমার ঐ রাত-জাগার কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনব বাপু! আমার

ভালো লাগে না। তুমি একটা অন্ত কিছু করবে। দুজনে চাকরী করলে আমাদের খুব চলে যাবে। আমরা লোক মাত্র—' থেমে যায় বিম্‌লি।

যৌথ জীবন রচনার কল্পনা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে টুকিটাকি কথা ব'লে যায় বিম্‌লি। দুজন চাকরী করলে কী সুবিধে আর কী অসুবিধে, জানায় সে। তাদের ভাবী সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারও আলোচনায় আসে। সব কথাবার্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে আগামী ক্ষুদ্র অতিথিটির অস্তিত্ব।

গোলাপ বলেছে, ছেলে হবে নিশ্চিত!

বিম্‌লিও সে ব্যাপারে একমত। বিম্‌লি চোখ বুঁজলে ছেলেটিকে দেখতেও পায়। ছেলের মুখে গোলাপের মুখটাই যেন বসানো। কান্নাটাও যেন শুনতে পায় বিম্‌লি। আর দশটা কচি ছেলের মতোই, কিন্তু কোথায় যেন একটু আলাদা, বিম্‌লি ঠিক চিনতে পারে, সে-কান্না শুনলেই বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে—বাছার কী হ'ল!

গোলাপও মনের মধ্যে দেখতে পায় ছেলেকে। খোকন। সাগরীর ছাঁচে মুখখানা ঢালা। এবার কি তবে খোকন বিম্‌লির মুখের ছাঁচটা প'রে আসবে? সেটা ভালোমতো কল্পনা করতে পারে না গোলাপ!

আগে গোলাপ-বিম্‌লির কথা হ'ত খুব কম। এখন অনেক কথা হয়। গোলাপ নিজেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়। কথা বলতে কিন্তু তার ভালোই লাগে। তার ভবঘুরে বৃত্তির কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প বলে সে, বিম্‌লির চোখে সপ্রসংশ বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে ওঠে, আসরে-দেখা রাজার আর এক মূর্তি হয়তো কল্পনা ক'রে নেয় বিম্‌লি, গোলাপের একটা আমেজ লাগে সেই চোখের দিকে তাকিয়ে অনর্গল কথা ব'লে যেতে!

বিম্‌লিও কত কিছু বলে। কিন্তু তার অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রদর্শনী নেই। যা অভিজ্ঞতা, তা অন্তরজীবনের। কিন্তু গোলাপ-বিরহিত সুদীর্ঘ কালটা সম্পর্কে সে একটু নীরবই থাকতে চায়। সে বলে তার কৈশোরকালের কথা। খুব ডানপিটে মেয়ে ছিল বিম্‌লি। পাড়ার লোকে তটস্থ থাকত। গালাগালিও দিত—'অত দপ্‌দপানি থাকবে না লো, থাকবে না! তেজ দেখিয়ে নে। বিয়ে হ'লে সোয়ামীর লাথি খেলে তেজ মরবে!'

গোলাপ সেই তেজী একগুঁয়ে ডানপিটে কিশোরীটাকে মনে করবার চেষ্টা করে। কিশোরী মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ-রাত্রিতে শুভদৃষ্টির মুহূর্তটিও তার মনে নেই। বিম্‌লিকে কিশোরী কল্পনা করা কঠিন গোলাপের পক্ষে। কল্পনা করতে গেলেও হঠাৎ ফস্‌ ক'রে কখন যেন সে যুবতীতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়।

অথচ আশ্চর্য, সেই বাসর-রাতের কথা নাকি গোলাপের চেয়ে বয়সে ছোট বিম্‌লির সব মনে আছে। কি জানি, কতটা বিম্‌লির মন-গড়া, তা গোলাপের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়।

একদিন বিন্দু বলে, 'গোলাপদা, আমি মেজবৌদিদের ঐ ইস্কুলে ভর্তি হবো।' ইস্কুল অর্থে সেই 'উদ্বাস্তু শিল্প-শিক্ষালয়'।

গোলাপ বলে, 'হয়ে যা না। কে বারণ কচ্ছে?'

'দাদার মত নেই।'

'কেন?'

চুপ ক'রে রইল বিন্দু।

'কি রে?'

বিন্দু লাজুক। তবে গোলাপের কাছে লজ্জাটা একটু কম। একটু গড়িমসি ক'রে ব'লেই ফেলল, 'দাদার ইচ্ছে আমায় বিয়ে দেয়।'

হাসল গোলাপ: 'ভালো কথা। তাতে তোর আপত্তি কী?'

বিন্দু ব্যাপারটা কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। অসহায়ভাবে বলল, 'আহা, তা নয়, আপত্তির কথা উঠছে না, তুমি বুঝতে পারছ না, দাদার টাকা নেই।' একটু থেমে মৃদুস্বরে বলল, 'তাই বলছিলুম—'

রূপ ও রুপোর অভাব বিন্দুর বিয়েতে বাধা। তাই বিন্দুর ইচ্ছে একটা কাজকর্মে লেগে যায়। পূর্ণ বোনকে কাজে আসতে দিতে চায় না, সনাতন পন্থায় বিয়ে দিতে চায়। ইচ্ছা শুভ, কিন্তু অর্থাভাবটা অশুভ। আর গোলাপও লক্ষপতি নয়; সাগরীর গয়নাগুলো তো সবই যাবার দাখিল। এদিকে এরা তাকে পূর্ণর দরের একজন অভিভাবক ভেবে বসে আছে। এতটা জড়িয়ে পড়ছে ব'লে বিরক্তিই লাগছিল গোলাপের। অথচ মেয়েটার মুখ দেখলে মায়া হয়।

বলল, 'আমায় কী করতে হবে বল্।'

'তুমি দাদাকে একটু ব'লে দাও। তাহলে দাদা রাজি হবে;'

'আচ্ছা, দেখি।'

সোনা অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড ক'রে বসল। হঠাৎ একদিন সে কোলকাতায় এসে হাজির। পরিচিত কেউ বহরমপুর থেকে কোলকাতা আসছিল, সেও সঙ্গে চলে এসেছে।

বসন্ত প্রমাদ গণল।

বসন্তর ঠিকানাটাই দেওয়া ছিল বহরমপুরে। গোলাপের আসল ঠিকানা ওখানে গোপন ছিল। বসন্তর ঘরেই এসে উপস্থিত হ'ল সোনা।

বসন্ত আর তার পরিচিত একটি লোক একটা একতলার জীর্ণ ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। রান্না নিজেরাই করে, দরকার-মতো হোটেলেও খায়। সাগরী তাকে গোলাপদের বাড়ীতে থাকতে বলেছে বহুবার। বসন্ত রাজী হয়নি। পাশাপাশি থাকলে হাঁড়ি-পাতিলেরও ঠোকাঠুকি হয়। বসন্তর আশঙ্কা এক বাড়ীতে দুই বন্ধু থাকলে কলহ অনিবার্য। অতএব দূরে থেকে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা ভালো। সাগরী আর গোলাপই তার জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। কিন্তু মনের দিক থেকে যত কাছে, বসবাসটা তত কাছে করতে চায় না।

বসন্তের সহবাসীটির বাড়ী বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে। সপ্তাহান্তে সে দেশে চলে যায়। আবার সপ্তাহের সুরুতে কোলকাতা আসে চাকরী করতে।

সৌভাগ্যক্রমে আজ সে-লোকটি কোলকাতায় ছিল না। ঘরে বসে বসন্ত একা। বসন্তের মুখ দিয়ে বেরোল, 'তুমি ?'

'চিনতে পারছো না, মনে হচ্ছে।' বাঁকা চোখে তাকিয়ে একটু হেসে বলল সোনা। 'আশ্চর্য হোচ্ছো ?'

'তা হচ্ছি।'

'গোলাপদা কোথায় ? এ বিছানাটা বুঝি গোলাপদার ?' সহবাসীর বিছানাটা দেখাল আঙুল দিয়ে। 'বসা যাক্ তাহ'লে এ বিছানাটাতে। তুমি তো আশ্চর্যের চোটে বসতে বলবে ব'লেও মনে হচ্ছে না। আশ্চর্য হোচ্ছো কেন ?'

'অনেক কারণ।'

'দুটো-একটা অন্তত শুনি।'

'এতদিন আমায় বলতে 'আপনি'। আজ হঠাৎ হলুম 'তুমি', এটাই কি কম আশ্চর্যের কথা ?'

সোনা বেশ শব্দ করেই হাসল : 'এই ? আমি বলি কী-না-কী ! আলাপ বাড়লে 'আপনি' তো সব সময়ই 'তুমি হ'য়ে যায়, এ আবার নতুন কি ? যাক্‌গে, তোমার আপত্তি আছে নাকি ?'

'বলা-কওয়া শেষ ক'রে আপত্তির কথা জিজ্ঞেস করছ ?'

'তাও করতুম না—নেহাত তুমি কথাটা তুললে ব'লেই—। এ তো গেল একটা। আর কি জন্যে আশ্চর্য হচ্ছিলে ?'

'হঠাৎ এলে, তাই।'

'দাদার বাড়ীতে বোন আসবে, তার আবার হঠাৎ কি? এর পর স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রী এলেও তুমি আশ্চর্য হবে।' খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সোনা। হাসি থামিয়ে যেন মজা দেখবার জন্যেই দুষ্টু-চোখে তাকাল বসন্তর দিকে—সোজা তাকিয়েই রইল।

'তবু একটা কিছু দরকার আছে মনে হচ্ছে।'

'দরকার—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। কিন্তু গোলাপদা কোথায়?'

'গোলাপ কোলকাতার বাইরে গেছে।'

রসিকতার জবাব দেওয়ার মতো ক'রে বলল সোনা, 'ও, বহরমপুরে গেছে বুঝি?'

'না। অন্য জায়গায়। পালা আছে!'

হেসে বলল সোনা, 'বেশ, ভালোই তো। এ ঘরেই দুজনে কাটানো যাবে ক'টা দিন—গোলাপদা আসা পর্যন্ত।'

'এ ঘরে?' স্পষ্টই বিব্রত দেখাল বসন্তকে।

'তা কোথায় যাব বাপু এ বিদেশে বিভূঁইয়ে!'

'বহরমপুরে চলে যাও।'

'বা রে, তাহলে এলুম কেন?'

'এলে কেন, তা আমি কি করে জানব। বললে না তো আমায়।'

'সত্যি জানতে চাও?' হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে এল সোনার গলা।

'নিশ্চয়ই।'

'বলছি। আগে বল গোলাপদা কোথায়?'

'আগে আমার কথাটার জবাব শুনি, তারপরে বলব।'

সোনা উঠল—দুললো তার সর্বাঙ্গ। সারাটা দেহে যৌবনকে যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে অতি অযত্নে। চোখে কিন্তু হঠাৎ লেগেছে একটা গভীর দৃষ্টি। চটুল চাউনি যে এ চোখে একটু আগেও রাজত্ব ক'রে গেছে বোঝবার উপায় নেই। সোনা এসে বসল বসন্তর বিছানাটাতে।

'তুমি আর আজকাল বহরমপুরে একদম যাও না কেন?'

'কাজকর্ম থাকে। তা ছাড়া খরচা। আর বন্ধুর মামাতো ভাইর বাড়ীতে এত অতিথ্ হ'লে—' হেসে হালকা ক'রে দেবার চেষ্টা করল সোনার গাম্ভীর্যটাকে, 'জামাই দু'দিন বেশী থাকলে লোকে প্রহার দিয়ে দেয়।'

'আমাদের বাড়ীটা কি শুধু বন্ধুর মামাতো ভাইর বাড়ী? আমাদের তুমি

চিরকাল পর করেই রাখলে।' খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। 'কেন তুমি আমাদের পর ভাবো, পর ক'রে রাখো। তুমি কি কিছু দেখতে পাও না—চোখ নেই তোমার ?'

প্রশ্ন-আকুল চোখে তাকাল সোনা বসন্তর দিকে।

বসন্ত তখনও প্রাণপণে হালকা করবার চেষ্টা করছে আবহাওয়াটা—যেন সোনার আগের ঠাট্টার স্বরের কথাগুলোর জবাব দিচ্ছে এমনভাবে বলল, 'তুমি কি এই কথা জিজ্ঞেস করতে বহরমপুর থেকে ছুটে এলে নাকি ?'

সোনা আশ্চর্য এক করুণ-স্থির চোখে তাকাল বসন্তর দিকে; ধীরে বলল, 'যদি বলি তাই ?'

বসন্তর দিকে একটু এগিয়ে এলো সোনার ঊর্ধ্বাঙ্গ, মেলে ধরল তার যৌবন-অভিনন্দিত মুখের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

বসন্ত দেখল, আর এড়ানো সম্ভব নয়। বরং সোজাসুজি প্রশ্নটার সামনে দাঁড়ানোই ভালো। বলল—ধমকের সুরেই বলল, 'ছেলেমানুষী কোরো না, সোনা।'

সোনা চাপা আর্তকণ্ঠে বলল, 'আমার ছেলেমানুষী করার দিন গিয়েছে। আমার মেয়েমানুষটাকে কি তোমার চোখে পড়ে না।'

সোনার মেলে-ধরা মুখের সামনে থেকে স'রে মাথা নিচু করল বসন্ত। বলল, 'সোনা, এ কথা এখন থাক্।'

চুপ ক'রে বসে রইল দুজনে। কারুর মুখে কথা নেই।

কিছু পরে সোনা জিজ্ঞেস করল, 'গোলাপদা কোথায় ?'

এতক্ষণ নিজের সমস্যাতেই বিব্রত ছিল বসন্ত। সোনার প্রশ্নটাতে সম্বিৎ ফিরে এল—সাগরী-গোলাপের সমস্যাটাও তো রয়েছে, বরং সেটাই জটিলতর। এখন রূঢ় না হ'য়ে সাগরীকে বাঁচাবার জন্যেই একটু নরম হওয়া দরকার। তা ছাড়া, সোনা আবার থেকে যেতে চাইছে এ ঘরে, তা পারে ও। কিন্তু বসন্ত সেটা হ'তে দেবে না, অর্থাৎ গোলাপের বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবেই সোনাকে—আত্মরক্ষার জন্য। তাই বরং একটু কোমল হ'য়েও সোনাকে সাগরী-প্রসঙ্গে সংযত রাখা দরকার।

'গোলাপদা কোথায়—বলছ না যে ?' তাগাদা দিল সোনা।

'বলছি।' বসন্ত সোনার হাতটা ধরল। 'কিন্তু আগে একটা কথা দিতে হবে সোনা।'

সোনা বসন্তর ব্যবহারে আশ্চর্য হ'ল। বসন্তর সেই স্পর্শে তার চোখ বুজে এল, সমস্ত চেতনা দিয়ে সে পান করছিল ঐ স্পর্শের স্বাদটুকু।

সোনা হেসে বলল, 'আমি কেন কথা দোব? তুমি তো আমাকে কোন কথা দাওনি।'

বসন্ত সোনার উক্তির গুরুত্বে ইচ্ছে করেই কর্ণপাত করল না। হালকা-মেজাজী গলায় বলল, 'শোন সোনা, একটা গল্প বলি।'

সোনাও বসন্তর তালে তাল দিল। আগ্রহের সঙ্গে চোখ বড় করে এগিয়ে বসল, খুশী-খুশী ছেলেমানুষী স্বরে বলল, 'বলো। এক দেশে এক ছিল রাজা—' ঘাড় কাত ক'রে প্রশ্ন করল সোনা, 'তারপর?'

বসন্ত ব'লে গেল রাজারই কাহিনী—আনুপূর্বিক। সোনার বিস্ময়ের ভান প্রকৃত বিস্ময়ে পরিণত হ'ল।

বসন্তর বুক কাঁপছিল। এ কাহিনী সোনার না জানাই উচিত। কিন্তু কতদিন এই দ্বৈত সত্তা বজায় রাখা চলে? এ যে ভাঙবেই—অবশ্যম্ভাবী। সাগরী আর গোলাপের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল বসন্তর। কাহিনী বলার মধ্যে মধ্যে বারবার থামল বসন্ত; তার মুখ দিয়েই এ গোপনতা প্রথম ক্ষুণ্ণ হ'ল। তার মুখের এই গল্প থেকেই সাগরীর দুর্ভাগ্য না শুরু হয়! কিন্তু সাগরীকে রক্ষা করবার জন্যেই সে এটা করছিল।

গল্প শেষ ক'রে বসন্ত বলল, 'চল, তোমায় গোলাপদের বাড়ীতে দিয়ে আসি। কিন্তু কথা দাও, সোনা, তোমার মেজবৌদির, মানে বিম্‌লির কথা ঘুণাক্ষরেও জানাবে না সাগরকে, আমরা দুই বন্ধু যেমন যাত্রা ক'রে যাচ্ছি সাগরের সঙ্গে, তুমি তেমনি করবে।'

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে স্পষ্ট ক'রে তাকাল সোনা বসন্তর চোখে।

বসন্ত ধরল সোনার হাতটা: 'কথা দাও, সোনা!'

সোনা বসন্তর হাতের মধ্যে ধীরে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'তুমি সাগরকে খুব ভালবাসো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কেন?'

একটু হেসে বলল সোনা, 'আমি তোমাকে খুব কাটখোট্টা লোক ভেবেছিলুম গোড়ায়। এখন ভুল ভাঙছে।'

'না, সোনা আমি কাটখোট্টাই। কিন্তু মানুষ তো আমিও।'

'না, তুমি কাটখোট্টা নও।' বসন্তর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিল সোনা। এই ভাবে হাতে হাত রেখে দুজনের মধ্যে একটা গোপনতার চুক্তি-স্বাক্ষরের শিহরণ জাগছিল তার মজ্জায়।

'কথা দিচ্ছ তাহ'লে ?' সোনার আবেশটা কেটে দিল বসন্ত।

চোখ খুলে মিষ্টি ক'রে হাসল সোনা : 'তুমি তো আমায় কোন কথা দিলে না।'

বিব্রত বোধ করল বসন্ত।

সোনা তাকিয়েই রইল তার দিকে। চোখে তার তখনও মিষ্টি হাসি। আশ্চর্য হ'ল বসন্ত সোনার চোখের দৃষ্টি দেখে। সেখান থেকে সরাল না নিজের চোখ। উভয়ের দৃষ্টি পরস্পরের হাত ধরল মুহূর্তের জন্য।

সোনা বলল, 'কী দেখছ অমন ক'রে ?'

'দেখছি তোমায়, সোনা। আশ্চর্য! তোমায় দেখেও আমার আশ্চর্য লাগছে।'

'কেন ?'

'তোমায় এমন দেখিনি আগে কোনদিন।'

এই বোধহয় প্রথম বসন্তর দৃষ্টিতে সোনা লজ্জা পেল। চোখ নামাল সে। ক্ষীণস্বরে বলল, 'অমন ক'রে তাকিও না।' বসন্তর হাতটা তার হাতের মধ্যেই ধরা রইল। তার মধ্যে এক গভীরতর নারীর উদ্বোধন হচ্ছিল। সেই জন্মবেদনায় বুকটা ব্যথিত—যেন এক-সমুদ্র রুদ্ধ কান্না মুক্তি-পথের সন্ধানে আলোড়িত হচ্ছে। জল এলো সোনার চোখে।

বসন্ত বলল, 'একি, তুমি কাঁদছ কেন ?'

লজ্জা পেল সোনা, তাড়াতাড়ি চোখ মুছে করুণভাবে হাসল : 'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে—কে যেন ?' গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে আসবার চেষ্টা করল সোনা মনের গভীর থেকে। 'এতদিন তো শুধু হাসিই দেখেছ, তাই একটু কান্নাও দেখালুম।'

বসন্ত হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'তা হ'লে ধরে নিচ্ছি তুমি কথা দিচ্ছ।'

সোনা উঠে দাঁড়িয়ে হাসল : 'আমিও তোমার কথাটা ধ'রে নেব নাকি ?'

'চল, বেরিয়ে পড়ি।' সোনার প্রশ্নের উত্তর দিল না বসন্ত।

সোনা সেটা বুঝে হঠাৎ অপমানিত বোধ করল। অপমান তার আগেও

বোধ হ'য়েছিল, কিন্তু গায়ে মাখেনি। কিন্তু এখন বেশী ক'রে বিঁধছে সেটা। হঠাৎ পুরানো সোনা আরো শাণিত হ'য়ে ফিরে এল যেন। চাপা অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'আমার হাতেও অস্ত্র রয়ে গেল কিন্তু।'

'অস্ত্র ?'

সোনার চোখে প্রতিহিংসার আগুন সূক্ষ্মভাবে খেলে গেল: 'হ্যাঁ, এই অস্ত্র দিয়ে তোমার আদরের সাগরের জীবনে আমি আগুন লাগিয়ে দিতে পারি।'

'এ তুমি কী বলছ সোনা ?' ভয়ার্ত স্বরে বলল বসন্ত। সোনার হাতটা খপ ক'রে চেপে ধরল বসন্ত: 'এ কাজ তুমি কখনও কোরো না, সোনা। এতে তোমার কোন লাভ নেই।'

'আমার লাভ-লোকসান তুমি কি ক'রে বুঝবে ? তা ছাড়া লোকে কি সব সময় অত লাভ-লোকসান ভেবে কাজ করে ? এই যে আমি হুট্ করে চলে এলাম বহরমপুর থেকে কোলকাতায়—অত খুতিয়ে ভেবেছি কি ?'

বসন্ত বোবা হ'য়ে গেল। হাতটা ঝরে পড়ল সোনার হাত থেকে।

সোনার চোখের কোণে সেই আগুনের শিখাটা মাঝে মাঝে লকলক ক'রে যাচ্ছিল। বসন্তর আর্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলছিল, 'সব মানুষই তো স্বার্থপর। আমিও হয়তো তাই। যে মেয়েকে আমি কোনদিন জানি না চিনি না, তার সুখ-দুঃখে আমার কি কিছু এসে যায় ? আমার কাছে আমার সুখ-দুঃখটাই বড়।'

বসন্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সোনা বলল, 'চলো।'

'হুঁ, চলো। তোমায় বিশ্বাস করলুম আমি।'

'আমায় বিশ্বাস করো তুমি ?'

'কেন করব না !'

'মিথ্যে কথা।'

'তাহলে এসব কথা কি ক'রে বললাম তোমায় ?'

'দায়ে পড়ে।'

গোলাপ সোনাকে দেখে চম্‌কে উঠল। তবে বসন্তর কাছ হ'য়ে আসছে, সুতরাং খানিকটা তালিম পেতেও পারে।

বসন্তও সোনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিল না।

সোনা বলল, 'চলেই এলুম, গোলাপদা। তুমি তো আর আনলে না। ভাবলুম বৌদিকে একটু দেখে যাই। সুন্দর বৌ ব'লে তুমি তো দেখাতেই চাও না—যেন দেখামাত্র গপ্‌ ক'রে গিলে খেয়ে ফেলব।'

গোলাপের গলা দিয়ে কোনরকমে বেরোল, 'আয়।'

বসন্ত সোনার প্রাথমিক সুরটা শুনে একটু আশ্বস্ত হ'ল।

সোনা সাগরকে বলছিল, 'তুমি নিশ্চয়ই বৌদি।'

বসন্ত বলল, 'সাগর, এর নাম সোনা, গোলাপের মামাতো বোন।'

গোলাপ অতিকষ্টে যোগ করল, 'ঐ যে বহরমপুরে থাকে।'

সাগরী কোনদিন গোলাপের কাছে শোনেনি যে মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে তার বহরমপুরে দেখা হ'য়েছে। কেন গোলাপ এটা গোপন করল—কেন? সাগরী তার নারীসুলভ সংস্কারবশে আঁচ করল, এই গোপনতার সঙ্গে গোলাপের ইদানীং কালের অদ্ভুত ব্যবহারের যোগ আছে। কোথায় সেই যোগ? সাগরীর চোখে তো সব অন্ধকার। বসন্ত মারফত এল কেন মেয়েটা?

সাগরী তার চিন্তার কিছুই প্রকাশ করল না। হেসে স্বাগত জানাল সোনাকে, 'এসো, ভাই।'

গোলাপ বলল, 'সোনা, কিন্তু তুই একা-একা এলি যে, বাড়ীর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া ক'রে আসিসনি তো, জানে তো ওরা?'

'কিচ্ছু ভাবনা কোরো না দাদা।'

গোলাপ খুব ব্যস্ত হ'য়ে উঠল: 'ভাবনা তো করছে তোর বাড়ীর লোক। না, যাই, পোস্টাপিসে গিয়ে ওদের একটা চিঠি—না, টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে আসি। বেশ, তুই যদি ব'লেই আসিস, তাহ'লেও তোর পৌঁছনোর সংবাদ দিতে হবে তো। বোস তোরা। আমি যাব আর আসব।'

গোলাপ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। আসলে সে ব্যস্ত হ'য়েছিল অন্য কারণে। সোনার সন্ধানে আবার পূর্ণ ইত্যাদি এসে হাজির না হয়। সোনা এখানে ভালোই আছে, এটা ওদের জানা থাকলে অন্য কারুর আসবার আশঙ্কা ততটা থাকে না।

গোলাপ পোস্টাপিস থেকে ফিরে এসে দেখল, সোনা ইতিমধ্যেই বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সাগরীর সঙ্গে রান্নাঘরে কাজ করছে টুকিটাকি, আবার ঝুমু-ঝুনুর খেলার রান্নাঘরেও সে নিমন্ত্রিত অতিথি।

রুমু-ঝুমুও 'পিসীমণি'-কে এর মধ্যে তাদের খেলাঘরের একজন সাথী হিসেবে মনে করছে। সোনা তাদের পুতুল দেখেছে, যত্ন ক'রে কাপড় পরিয়েছে পুতুলদের, ঘর-সংসার পেতেছে, পুতুল-বিয়ে দিয়ে নেমন্তন্নের উদ্যোগ-আয়োজন সুরু করেছে।

বসন্ত অনেকটা যেন অবান্তর হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সোনা বসন্তর দাঁড়াবার ভঙ্গীটা দেখে হাসল : 'বোকার মত দাঁড়িয়ে আছো কেন ?'

'বোকা যে, চালাকের মতো দাঁড়াবো কেমন ক'রে ?'

'বোকা কে, বসন্ত ?' বাড়ীতে ঢুকল গোলাপ। 'ওরে বাবা, আমরা তাহ'লে দাঁড়াই কোথায় ? কি বলছিস রে ?'

'বোকা নয়তো কি !' খিলখিল ক'রে হাসল সোনা। 'এই ছাখো না, আমায় বলছে সিনেমা দেখাবে, বোকার মত খরচ নয় ?'

বসন্ত আশ্চর্য হ'ল : 'সে-কথা কখন বললাম ?'

'ওমা ! কী মিথ্যুক ! গোলাপদাকে দেখেই অমনি বেশ টপ করে ভুলে যাচ্ছো ? রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে বললে না ?'

'ভোলবার কথাই নয়। যা বলিনি—'

সোনা হাসল : 'গোলাপদা, ছাখো তোমার বন্ধুকে !'

গোলাপও হেসে বলল, 'বেশ বসন্ত, তুই বলিসনি। না ব'লেই না-হয় নিয়ে যা। বেচারা ছু'দিনের জন্যে কোলকাতা দেখতে এসেছে।'

গোলাপ সোনাকে যত বেশী সম্ভব বাড়ীর বাইরে সাগরীর কাছ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করছিল। যতক্ষণ বসন্তর আওতার মধ্যে থাকে ততই মঙ্গল।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সাগরী। হেসে বলল, 'তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন বসন্দা ?'

সাগরী ওদের বাইরে বার ক'রে নিরিবিলিতে গোলাপের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিল।

বসন্ত দেখল, আর লেবু কচলানো চলে না।

সোনা বিজয়িনীর ভঙ্গীতে দুষ্টু-হাসি হাসল।

ওরা সিনেমায় চলে যাবার পর সাগরী গোলাপকে জিজ্ঞেস করল, 'সোনাদের সঙ্গে তোমার বহরমপুরে দেখা হ'য়েছে বলনি তো ?'

'হ্যাঁ—মানে—কিরকম মেয়ে দেখছ তো। আমার বিশেষ পছন্দ হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি।'

খুব একটা বিরক্তির ভান করল গোলাপ।

সাগরী বুঝছিল, গোলাপের উত্তরে তার প্রশ্নের জবাবটা নেই। যে-গোলাপ তাকে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় একাধিকবার বলে, সে হঠাৎ এ ঘটনাকে আড়াল করল কেন? এ রহস্যের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে গোলাপের অধুনা-পরিবর্তনের কারণ। কষ্ট হ'তে লাগল তার—গোলাপ ইচ্ছে করেই কিছু গোপন করছে তার কাছ থেকে। কিন্তু কোন ব্যাপার নিয়েই বেশী খোঁচাখুঁচি করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বরং সে ধৈর্য ধরে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবে। একদিন জানতে সে পারবেই।

কষ্ট পাচ্ছিল গোলাপও—সাগরীর কাছেও নিজেকে গোপন করতে হচ্ছে ব'লে।

সাগরী ইতস্তত ক'রে বলল, 'এদিকে আমি তো আর—'

'কি? থামলে কেন?'

'খরচ চালাতে পারছি না।'

গোলাপ কাতরস্বরে বলল, 'জানি, সাগর। এতদিন যে কী করে চালিয়েছ ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে। অথচ আমি তোমার গয়নাগুলো পর্যন্ত খুইয়ে বসে আছি।'

সাগরী করুণ অনুনয়ের সুরে বলল, 'ও-কথা বোলো না। আমি গয়নার কথা বলিনি।'

'না, বলোনি। জানি, কোনদিন বলবেও না। সেই তো হ'য়েছে আমার আরো জ্বালা। তুমি যদি বলতে, তবে দু'দণ্ড ঝগড়াও করতে পারতুম।'

'ওগো, ঝগড়ার কথা কেন বলছ? তোমার সঙ্গে কি আমার ঝগড়ার সম্পর্ক? আর ঐ দু'-রতি গয়নার জন্যে আমি ঝগড়া করব তোমার সঙ্গে? তার আগে যেন আমার মরণ হয়!' গয়নার মূল্য সাগরীর কাছে অর্থে নয়, এ তার স্বামীর ভালবাসার প্রতীক। এগুলো স্বামীর সোহাগ-স্পর্শের মতো তাকে জড়িয়ে থাকে। 'এ গয়না তো তুমিই দিয়েছ, দরকার হ'লে খরচা করবে, ক্ষতি কি। আবার যেদিন সময় আসবে, তুমিই নতুন গড়িয়ে দেবে।'

গোলাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আর সে-দিন আসবে কিনা তাই ভাবছি, সাগর!'

'ও-কথা বোলো না। নিশ্চয়ই আসবে। জীবনে আমি কারুর কোন

ক্ষতি করিনি, তবু আমার খোকনকে ভগবান টেনে নিয়েছেন, আরো ক্ষতি করবেন ?'

আরো অনেক বড় সর্বনাশ যে ভগবান আসন্ন ক'রে তুলেছেন, এ-কথা তো বলা যায় না সাগরীকে। বলল, 'তোমার অনেক বড় আশা, সাগর, আমি পোড়-খাওয়া মানুষ, আশা করবারও জোর পাই না যেন।'

'আশা ছাড়া মানুষ বাঁচবে কি ক'রে ?'

'বাঁচছি না তো আমি। তিল-তিল ক'রে জীবনটা খুইয়ে চলেছি।'

'ও-কথা বোলো না।' আর্তস্বরে বলল সাগরী।

'সাগর, দারুণ তোমার সহ্যশক্তি।'

'ছোটবেলা থেকে দুঃখ-কষ্ট স'য়ে-স'য়েই যে আমি মানুষ।

'এখনও তুমি খালি সহ্য করেই চলেছ।'

'এ-কথা বলছ কেন ? দুঃখকে এত বড় ক'রে ভাবছ কেন ?'

'দুঃখ বড় কি ছোট, জানি না। কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

গোলাপের অস্থিরতায় সাগরীর জল এল চোখে : 'কী তোমার কষ্ট আমি যে বুঝি না। আমি কী করব ব'লে দাও তুমি। বলো, চুপ ক'রে থেকো না।' একটু থেমে বলে, 'আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো ? আমি তোমার সব কষ্ট বুঝতে পারি না। তখনই শুধু আমি কাঁদি।'

হঠাৎ সেই পুরাতন ভয়টা গোলাপের বুকের কাছে দ্রুত স্পন্দিত হ'তে শুরু করল। না, সে বলতে পারবে না। নিমেষে তাহ'লে চুরমার হ'য়ে যাবে তার জীবন। এখনও সে অতি কষ্টে আঁকড়ে ধরে আগলে রেখেছে। কিন্তু আর ক'দিন ? দুটি বিপরীত প্রান্তকে দু'হাতে ধরে রাখবার চেষ্টায় তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত, বুকটা প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

উঠে পড়ল গোলাপ।

'কোথায় যাচ্ছো ?'

'শরতের কাছে। চাকরী চাই একটা।'

বেরিয়ে গেল গোলাপ।

সাগরী একা। ঘরের জানালার সামনের জমিতে প্রাসাদ উঠছে— গোলাপদের জীর্ণ 'রাজপ্রাসাদ'কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিষে দিয়ে। ঐ জমিটুকুর ওপরে খোকন বহুদিন খেলা ক'রে গিয়েছে। সেই ছোট ছোট দুটো পায়ের চিহ্ন হয়তো ছড়িয়ে ছিল ঐ জমির মাটির ওপরে, ঘাসের ডগায়। শিশুদের খেলাঘরে সঞ্চিত ছিল সে-চিহ্ন, সেই শিশু-কোলাহলমুখরতার মধ্যে একটি

কণ্ঠের অনুপস্থিতি সাগরীকে বেদনা দিয়েছে, তবু চোখ বুজলে মনে হ'ত, বুঝি ঐ সম্মিলিত শিশু-কাকলির মধ্যে সেই অতি-পরিচিত কণ্ঠও বাজছে। এখন সেই জমিটুকু থেকে শিশুদের খেলাঘর ভেঙে গেছে, শিশুরা নির্বাসিত।

যে-জানালার সামনে একটু কাত হ'য়ে দাঁড়ালে কোলকাতার দুর্লভ-দর্শন আকাশের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত, সে-আকাশকে মুছতে-মুছতে মাথা তুলছে বিরাট একখানা বাড়ী।

ছোটবৌ এসে দাঁড়ালো কাছে। সুন্দর ক'রে সেজেছে! পরিপূর্ণ দেহের পরে প্রসন্নতার আলো ছড়ানো। ছোটবৌর সে ক্ষিপ্র গতি নেই, এলো মন্থর ছন্দে। কথাও বলল ধীরে, 'চললুম, ভাই!'

ছোটবৌ বাপের বাড়ী যাচ্ছে মার কাছে—তার ছেলেপুলে হবে।

সাগরী বলল, 'টুকটুকে ছেলে নিয়ে ফিরিস যেন।'

ছোটবৌর গালে রক্তিম ছাপ দেখা দিল।

'ইস্, লজ্জা দেখ না মেয়ের!' সাগরী তার গাল টিপে আদর করল।

'আসি, ভাই! ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

সিনেমা-হলের পাশাপাশি দুটো সীটে বসন্ত আর সোনা।

হলের চানাচুরওয়ালাকে দেখে সোনা আদুরে সুরে বলল, 'আমি চানাচুর খাব।'

বসন্ত নির্বিকারভাবে চানাচুর কিনে দিল!

'বা রে! আমি একা খাব নাকি? খাও।'

খেলো বসন্ত।

'তুমি আমার ওপর চটে গেছো, না?'

'কেন, চটব কেন?'

'কথা বলছ না কেন তবে?'

'এই তো বলছি।'

'এ তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমি বলালুম। বল না, সত্যি, রাগ করেছ?'

'কেন, রাগ করব কেন?'

'বাড়ীর সবার মধ্যে মিথ্যে কথা ব'লে বোকা বানালুম তোমায়।'

'তাতে আর কি হ'য়েছে এমন!'

'কিছু হয়নি?'

'যা হ'য়েছে. বরং ভালোই হয়েছে।'

'কী ভালো ?'

'তোমার সিনেমা দেখা হ'ল একটা।'

'হুঁ, তা হ'ল। কিন্তু তোমার কী ভালো হ'ল ?'

'আমারও একটা সিনেমা দেখা হ'ল।'

'শুধু এই ? আর খারাপ যে কতটা হ'ল তোমার— !'

'কী খারাপ ?'

'একটা পেত্নীর মতো অসভ্য মেয়ের পাশে বসে থাকতে হচ্ছে।'

'একজন কেউ সঙ্গে থাকলে তো সিনেমা দেখতে লোকের বরং বেশী ভালো লাগে।'

'লোকের লাগে, কিন্তু তোমার এখন লাগছে না।' সোনা বসন্তর হাতটা ধরে একটু চাপ দিল। 'আমার দোষ হয়েছে মানছি, মাফ কর। অমন গোমড়া মুখ ক'রে থেকো না। মাঝে মাঝে ঐরকম এক-একটা খেয়াল আমার মাথায় চাপে। কিছুতে সামলাতে পারি না। একটা অসুখের মতো যেন। ছোট ছেলের দাঁত উঠলে যেমন না-কামড়ে তার সুখ নেই, এও তেমনি।'

হল্ অন্ধকার হ'য়ে গেল। বসন্তর হাতটা রইল সোনার হাতের মধ্যে। পর্দার প্রেমের শিহরণ সোনা অনুভব করছিল ঐ হাতখানার মধ্যে দিয়ে।

কোমলতার অভিনয়ে ক্লান্তি এসে গেছে বসন্তর। পারছে না আর সে। সোনা এমনিতেই উদ্দাম, বসন্তর কোমলতার ওপর ভিত্তি ক'রে সে এত দূর এগিয়ে আসে যে, বসন্তর পক্ষে মুশকিল হ'য়ে পড়ে। তা ছাড়া বসন্ত বুঝতেও পারে না, সোনার সঙ্গে ঠিক কি ভাবে ব্যবহার করা উচিত। একসময় মনে হয়, অনাবশ্যকভাবে বেশী রূঢ়, আবার কখনও কোমলতা বেশী প্রকাশ পেল ভেবে আশঙ্কা হয়। আর সোনা ছোটখাটো কথার ওপরেই এত চড়া সুরে বেজে ওঠে যে, প্রতি পদক্ষেপের নিক্তি-মাপা ব্যবহার তার পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছে।

অন্য একটা কথাও ভাবছিল সে। গোলাপ ও সাগরীকে বাঁচাবার জন্য তার এই কোমলতার অভিনয় সোনার সঙ্গে, সেটা তাদের কাছেই অন্য রঙে রঞ্জিত হ'য়ে দেখা দিতে পারে। বিশেষ ক'রে আজ সিনেমা যাওয়ার প্রসঙ্গে গোলাপ ও সাগরীর ব্যবহার বসন্তর ভালো লাগেনি। তারা বসন্ত ও সোনার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্কের অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে নিয়েছে অথবা শীগ্‌গিরই নেবে। তাহ'লে সোনার দায় এড়ানো অসম্ভব হ'য়ে পড়বে, কারণ এখনকার এই কোমল অভিনয়গুলোই প্রতিপক্ষের হাতে দলিল হ'য়ে উঠবে।

বসন্ত ঠিক করল, আজই একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবে। হাতটা অবশ্য সে এই মুহূর্তে টানতে পারল না। যেন একটা অভদ্রতা হ'য়ে যাবে মনে হচ্ছিল।

ইণ্টারভালের সময় বসন্ত বলল, 'তুমি সাগরকে বিম্‌লির ব্যাপারটা না ব'লে আমার কথা রেখেছে ব'লে ধন্যবাদ।' কাঠ হ'য়ে ব'লে গেল কথাটা।

সোনার মনে জ্বালা ধরে গিয়েছিল বসন্তর কথা বলার ধরন দেখে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে বসন্ত!

বাঁকা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল সোনা, 'বলিনি ঠিকই। কিন্তু বলব না তার ঠিক কি? দরকার হ'লেই বলতে পারি। এখনই তোমার ধন্যবাদ-টন্যবাদ সব বড়-বড় কথাগুলো খরচা করে ফেলো না, পরে আফশোষ হ'তে পারে বাজে-খরচ হ'ল ব'লে।'

সিনেমার পর বসন্ত ওর ডেরায় নিয়ে এল সোনাকে।

সোনা বলল, 'এখানে নিয়ে এলে কেন?'

একটু সময় চুপ ক'রে থেকে বসন্ত বল্লল, 'সোনা, তুমি বহরমপুর চলে যাও। আর আমাকে ক্ষমা কোরো।'

একটা বেদনার্ত অগ্নি-বিক্ষোভ সোনার চোখে ধক্ ক'রে জ্বলে উঠল। কিন্তু মুখে বাঁকা বিদ্রূপের হাসি টেনে বলল, 'যাই-না-যাই তাতে তোমার কি? তুমি তো খেতে-পরতে দিচ্ছ না আমায়।'

'সেটা বড় কথা নয়।'

সাপের মতো হিসিয়ে উঠল সোনা, 'তবে কেন যাব? তোমার সাগরের জন্যে?'

'না। সত্যি কথাই বলছি, আমার জন্যে।'

'তোমার জন্যে আমার কী দরদ? তুমি থাকো মরো আমার কি? আমার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক? সে-সম্পর্ক তোমার অন্য কারুর সঙ্গে থাকতে পারে,—ঐ আইবুড়ো বুড়ী মেজদির সঙ্গেই হয়তো থাকতে পারে।'

বিন্দুর প্রসঙ্গে হঠাৎ থমকে গেল বসন্ত। পরের মুহূর্তে বলল, 'বেশ, তাই যদি হয়, তুমি ভালোভাবে নিতে পারছো না কেন সেটা?'

'আমি লোকই যে খারাপ।'

'চল।' বলল বসন্ত।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি!' উদ্ধত-ফণা সাপের মতো ঘাড়টা তুলে বলল, 'তোমার পায়ে ধরে কাঁদবার জন্যে আসিনি। তেমন মেয়ে নয় সোনা।'

ছিট্‌কে রাস্তায় বেরোল সোনা।

বসন্ত তাড়াতাড়ি এসে তার পাশে পাশে চলতে লাগল। ক্রুদ্ধ সাপের মতোই দেখাচ্ছিল সোনাকে—কাকে কখন দংশন করে, ঠিক নেই। সাপের জিভের মতোই বিক্ষুব্ধ অগ্নির একটা শিখা সোনার চোখের কোণে মুহূর্তে মুহূর্তে লেলিহান হয়ে উঠেছিল।

সারারাত ঘুম হ'ল না সোনার। উদ্ধত ফণাটা শয্যায় আনত শান্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু একটা কিছুকে দংশন করতে চায় সে।

আজকাল রাতে ভালো ঘুম হয় না সাগরীরও। দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় তার শরীর ভাঙতে সুরু করেছে।

সকালে দুটি বিনিদ্র নারীর সাক্ষাৎ হ'ল।

গোলাপ গিয়েছিল বসন্তর ডেরায়—হয়তো সোনা সম্পর্কে কথা বলতেই।

সোনা বলল, 'বৌদি, তোমায় একটা কথা বলি, ভাই, এখন কেউ নে । তুমি হয়তো জানো না ব্যাপারটা, কিন্তু তোমার জানা দরকার।'

সোনার চোখ-মুখ ও কণ্ঠস্বরে সাগরীর বুকটা কেঁপে উঠল।

সোনা বলল, 'গোলাপদার আর-একটা বিয়ে আছে, তুমি জানো?'

একটা আকস্মিক চাবুকের মতো কথাটাকে ছুঁড়ে মারল সোনা সাগরীর দিকে। প্রথমটায় বিহ্বল, পরের মুহূর্তে যন্ত্রণাকাতর হ'য়ে উঠল সাগরীর মুখটা। সেই মুখ দেখে একটা বিকৃত ধরনের উল্লাস জাগল সোনার মনে। এখানেই শেষ নয়, আরো চাবুক সে হানবে, যন্ত্রণায় ছটফট করবে বসন্তর আদরের সাগর, তৃপ্ত হবে সোনার হৃদয়।

'আচ্ছা, তুমি সবটুকু ব'লে নাও।' সাগরী নিজেকে প্রাণপণে সংযত রাখবার চেষ্টা করছিল। তার সহ্যশক্তির প্রশংসা করে গোলাপ, আজ তার পরীক্ষার চরম ক্ষণ। যত নিদারুণ সংবাদ সোনা দিক, সহ্য করতে হবে তাকে।

সোনা ব'লে গেল বিম্‌লির কথা একদম প্রথম থেকে।

চেষ্টা সত্ত্বেও বেদনার স্বাক্ষর ছড়িয়ে ছিল সাগরীর মুখে। সেই বেদনার প্রতিটি মুখরেখাকে চোখ দিয়ে লেহন করছিল সোনা, তার মরু-তৃষ্ণার খানিকটা তৃপ্তি ঘটছিল তাতে।

ঘটনাটা শুনতে শুনতে সাগরী নিজেকে সামলেও নিচ্ছিল। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়েও উঠল সে। সোনা তার দাম্পত্যজীবনের বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে

যাচ্ছে ; যে-অন্ধকারে তার দৃষ্টি চলত না, সেখানে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের আলোকে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হ'য়ে গেছে।

কিন্তু সাগরী বুঝতে পারছে, এ ঘটনা ব'লে সোনা তার দাম্পত্যজীবনের সুখ-শান্তির ওপরে ইচ্ছে করেই আঘাত হানছে, সোনার চোখ-মুখের নৃশংস উল্লাস তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কেন সোনার এই নৃশংসতা, বুঝতে পারল না সাগরী। হয়তো বিম্‌লি-প্রীতির বশে, কিংবা অন্য কিছু, জানে না সাগরী। যে দুর্ভাগ্যই তার ভবিষ্যতে থাক্‌, আজ তাকে হারিয়ে যেতে পারবে না সোনা। নিজের বুকের আর্তনাদের মুখে হাত-চাপা দিয়ে নীরব করিয়ে রাখল সে।

সাগরী বলল, 'এসবই আমি জানি। আমার কাছে নতুন নয় কিছুই।'

সোনা একটু হতাশ হ'ল, 'ও, জানো! তোমার বসন্‌দা বলছিল তোমার কাছে সবটা ইচ্ছে করেই গোপন করা হ'য়েছে।'

'বসন্‌দা আমাদের ভেতরের সব খবর কি ক'রে জানবে?'

'তা বটে।' অস্বস্তি জাগছিল সোনার। তাহ'লে এখানেও হার হোলো বসন্তর কাছে? তাকে বোকা বানিয়ে ছাড়ল? তবু বসন্তর আদরের সাগরকে চাবুকের পর চাবুক হাঁকড়ে তার মুখের আর্তচিহ্নের মধ্যে সোনার প্রতিহিংসার আগুন কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা মেটাতে পেরেছে! দংশন-উদ্যত ফণাটা কাল থেকে সবটুকু বিষ নিজের মধ্যে সংহত ক'রে টাটিয়ে উঠেছিল, তার মুক্তিপথ পাওয়া গিয়েছে।

'কিন্তু তুমি আজ হঠাৎ এ-কথা আমায় বলতে গেলে কেন?' প্রশ্ন করল সাগরী।

স্পষ্টতই বিব্রত দেখাল সোনাকে : 'তোমার এটা জানা দরকার, বৌদি।'

সাগরী আর কথা বাড়াল না। অস্থির ও অসুস্থ লাগছিল তার।

'গোলাপদা, আমায় বহরমপুরে পাঠিয়ে দাও।'

'আচ্ছা, যাবি'খন।'

সাগরী বলল, 'ও এলো অত দূর থেকে কোলকাতা দেখতে। তা তুমি তো একটুও ওকে নিয়ে বেরোলে না?'

সাগরী একটু নিরিবিলিতে বসন্তর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।

গোলাপ ভাবছিল, সোনা সাগরীকে কিছু বলেনি, কিন্তু, বহরমপুরে ফিরে বিম্‌লিকে আবার সাগরী সম্পর্কে কিছু না ব'লে ফেলে। একে বিম্‌লি এখন

অন্তঃসত্ত্বা ; এসব খবর শুনলে খারাপ হ'তে পারে। সোনাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

গোলাপ বলল, 'হ্যাঁ, চল্ সোনা, আজ বিকেলে তোকে নিয়ে বেড়াতে বেরোব। বসন্ত, তুই একটু বাড়ীতে সাগরের কাছে থাকিস। সাগরের শরীরটা বড় খারাপ করেছে।'

বিকেলে গোলাপ আর সোনা বেরিয়ে যাবার পর সাগরী বলল, 'বসন্‌দা, বিম্‌লির কথা তুমি আমায় কোনদিন বলনি কেন? কেন আমার জীবনটা তোমরা সবাই মিলে নষ্ট করতে চাইছো?'

সোনার সামনে কাঁদতে পারেনি সাগরী, এখন ছটফট ক'রে কাঁদতে লাগল!

বসন্ত বুঝল, নাগিনী দংশন করেছে। তাকে না পেয়ে সাগরীকে; ঐ পথে দংশনের জ্বালাটুকু কিছুটা বসন্তর মধ্যেও সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া যায়।

বসন্ত আস্তে হাতটা রাখল সাগরীর মাথায়: 'সাগর, ইচ্ছে করেই বলিনি আমরা। তোকে অনর্থক অশান্তি দিয়ে কী লাভ!'

'ভালো না ছাই!' উপুড় হ'য়ে পড়ে কাঁদছিল সাগর।

'আর আমি যে গোলাপকে কথা দিয়েছিলাম, সাগর!'

কান্না থামল না সাগরীর।

বসন্ত বলল, 'কাঁদিস না সাগর! তোর এমনিতেই শরীর খারাপ।'

'শরীর আর আমার ভালো হবে না, বসন্‌দা!'

'ছি, ও-কথা বলতে নেই, সাগর!' তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল বসন্ত।

একটু শান্ত হ'য়ে সাগরী বলল, 'বসন্‌দা, তোমার বন্ধুকে যেন বোলো না যে, আমি সব জেনেছি। সে বড় কষ্ট পাবে তাহ'লে। কথা দাও!'

'বেশ, তাই হবে, সাগর!'

'তা ছাড়া, বড় ভয় করছে আমার, বসন্‌দা! ফাটল-ধরা পাড়ের মতো রয়েছি যেন; আমি জেনেছি এটুকু সে শুনলে তক্ষুনি একটা বিরাট শব্দে ভাঙন ধরবে।'

একটু বেড়িয়ে গোলাপ সোনাকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ছোট্ট একটা কেবিনে বসল পাশাপাশি।

গোলাপ বলল, 'তুই তো বসন্তর কাছ থেকে সবই শুনেছিস।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, দাদা।'

'সাগরকে কিছু না ব'লে আমায় বাঁচিয়েছিস্ তুই।'

সোনা আশ্চর্য হ'ল সাগরীর মনের জোর ও অভিনয়-ক্ষমতার কথা ভেবে। সাগরী তারই কাছ থেকে তাহ'লে প্রথম শুনেছে ব্যাপারটা। গোলাপ বলেনি তাকে, এবং আশ্চর্য, সাগরীও সোনার কাছে শোনার পর গোলাপকে বলেনি কিছু।

এমনিতেই গোলাপের ওপর একটা টান জন্মেছিল সোনার এই ক'মাসে। একটা মমতা ছিল। এ লোকটাকে নিজের দাদা ভাবতে তার গর্ব হ'ত, ভালো লাগতো। যা পূর্ণ সম্বন্ধে কোনদিনই হয়নি। সেই গোলাপকেও সে অজ্ঞাতসারে দংশন ক'রে ফেলেছে সাগরীর মারফত। সাগরীকে আঘাত ক'রে বসন্তকে সে ব্যথিত করতে চেয়েছে, সেদিকে কতটুকু সাফল্য আসবে তা জানে না সোনা। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, গোলাপের কাছে পৌঁছবে সোনার দংশনের বিষ। এই মুহূর্তে গোলাপ এত করুণ-গম্ভীর স্বরে সোনাকে 'বোন' ব'লে সম্বোধন করছিল, 'আমায় বাঁচিয়েছিস' বলছিল, যে একটা আন্তরিক বিষণ্ণতার মৃদু ঝংকার তার মনের মধ্যে বাজতে লাগল। না, সে বাঁচায়নি গোলাপকে, বরং বিষ-দংশন ক'রে এসেছে। এ কী করল সে! যার বিরুদ্ধে তার রাগ তাকে হয়তো ছুঁতেও পারল না, আর গোলাপকেই হয়তো আঘাত ক'রে বসেছে। অথচ লোকটা এখনও তার প্রতি অসীম বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত, তাকে জানাচ্ছে কৃতজ্ঞতা!

'সোনা, আমার কাছে একটা কথা দিয়ে যেতে হবে তোর।'

সোনা আতস্বরে বলল, 'না, দাদা, না। কোন কথা দিয়ে যেতে পারব না। তুমি আমায় বলিয়ে নিয়ো না, দাদা! আমি পারি না কথা রাখতে। শেষে তোমার বিশ্বাস হয়তো ভেঙে ফেলব, তোমায় কষ্টও দেব। কী দরকার কথা দিয়ে? আমি তোমায় খুব ভালবাসি, দাদা, তোমার ভালোই চাই, শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর।'

সোনা টেবিলের ওপর মাথাটা রাখল। তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

গোলাপ আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিল সোনার ব্যবহার দেখে; তার এতটা বিচলিত হবার কারণ সে খুঁজে পেল না। সোনা আজও একটু হেঁয়ালি রয়ে গিয়েছে তার কাছে। সবটুকু বোঝে না তাকে। কিন্তু তার অস্থির প্রাণশক্তি একটা আশ্রয় খুঁজছে, এটা সে অনুভব করে। তাই সব সময়ই

সে সোনার সঙ্গে একটা সস্নেহ ব্যবহার করে। যে-ব্যবহার সোনা হয়তো স্বভাব-দোষেই বাড়ী থেকে পায় না।

গোলাপ আস্তে আস্তে সোনার মাথার ওপর হাতটা রাখল: 'আমি তোকে বিশ্বাস করি, সোনা। তুই যে আমার ভালো চাস, তা আমি জানি।'

'কেন আমায় বিশ্বাস কর দাদা? জান না আমি কত খারাপ? শোনোনি বাড়ীতে? শ্যাখোনি?'

'ছি, নিজেকে অত খারাপ ভাবিস কেন?'

'আমরা যে সত্যি খারাপ, দাদা! ভালো হবার আমাদের কোন উপায় নেই।'

'সেকি—কেন?'

সোনা ব'লে গেল কত-কী কথা। গোলাপ প্রতিটি কথাকে বিচার-বিশ্লেষণ করল, নতুন চোখে দেখল গোলাপ তাকে। ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ সোনা—পূর্ণ কোনসময়ই খুব সচ্ছল ছিল না। লেখাপড়া তেমন শেখেনি, ভালো কিছু দেখেনি শোনেনি। থুবড়ো হ'য়ে বসে মনটা হ'য়েছে বদ্ধ জলাশয়ের মতো—পর-কুৎসা শুনে শুনে সেটা মনের মধ্যে থিতিয়ে নিয়েছে। তারপর হ'ল দেশবিভাগ। সবকিছু ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল—শুধু পায়ের তলার মাটিটুকু নয়, যে-মাটির ওপর ভর দিয়ে মন দাঁড়ায়, সে-সমাজ সে-মূল্যবোধ সব চোখের সামনে উপহসিত হ'ল, ভেঙে পড়ল। ভালো থাকার আর কোন মানে হয় না, ভালো হ'য়ে বসে থাকে শুধু বোকারা। খারাপরাই জীবনের সবকিছু পায়, জীবনকে ভোগ করে। বিন্দু খুব ভালো, কিন্তু আইবুড়ো মেয়ে থুবড়ো হ'য়ে কুঁকড়ে মরবে তিলে-তিলে, কোনদিকে কোন সার্থকতার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই তার। ইন্দু মরেছে অমনিভাবেই। ইন্দু আর বিন্দু যেন সোনার চোখে আঙুল দিয়ে তারই ভবিষ্যতকে দেখিয়ে দিচ্ছিল। যেন বলছিল—আমাদের অপমৃত্যু দেখে শিক্ষা নে। সোনাও ভবিষ্যতকে রঙীন ব'লে কল্পনা করতে পারল না—ব্যর্থ তার জীবন। কিন্তু বিন্দুর মতো তিলে তিলে মরবার মতো মেয়ে সে নয়। মরবার আগে আঘাত সে করবে—যেখানে যেমনভাবে পারুক। তার সামনে সুস্থ কোন আদর্শ ছিল না। যে পুরাতন দেশ-গাঁর সমাজ নড়বড়ে অবস্থাতেও তাদের কোনরকমে ধরে রেখেছিল, সেটা টুকরো টুকরো হ'য়ে যাচ্ছিল। এই ভাঙনটার মধ্যে ভাঙতেই শিখল সোনা, গড়তে নয়। চূর্ণ করবার

মধ্যে একটা নিষ্ঠুর আনন্দকে সে আবিষ্কার করল, রচনায় আনন্দ সে পেল না।

থামল সোনা। না, এই শেষকথাটা সে গোলাপকে বলবে না। সে-কথাটা একটা গোপন ব্যথার মতো তার বুকের মধ্যে থাক্। একটা জ্বালার মতো, একটা অপমানের মতো, একটা কাঁটার মতো সেটা মনে বিঁধে থাক। রক্ত ঝরুক সেখান দিয়ে, কিন্তু কাউকে প্রলেপ দেবার জন্যে সে ডাকতে পারবে না।

গোলাপ বলল, 'কি, থামলি যে? কী যেন বলছিলি?'

সোনা চোখের জলের মধ্যেও হেসে বলল, 'আমি যে একাই কথা বলছি, দাদা। তুমি কী বলবে বলছিলে?'

'কিন্তু সে-কথা তো তুই রাখতে পারবি না বললি।'

'বল, শুনি তো।'

'বিমলিকে গিয়ে আমার এদিককার, মানে সাগরের কথা কিছু বলিস না।'

গোলাপ সোনার হাতটা ধরল: 'কথা দিচ্ছিস?'

সোনা পরিপূর্ণ চোখে তাকাল গোলাপের দিকে। পুরুষের করুণ চোখ দেখলে মায়া হয় সোনার। বলল, 'আমি কিছু বলব না, দাদা।'

গোলাপ সাময়িক স্বস্তির আশ্বাসে চোখটা বুজল—বড় ক্লান্ত লাগছিল তার।

'দাদা, তোমার বড় কষ্ট, না?'

গোলাপ এই সহানুভূতিশীল মেয়েটির দিকে চোখ মেলল: 'তুই বুঝিস?'

'সবটুকু হয়তো বুঝি না, দাদা। তবু তোমায় দেখে আমার মন-খারাপ হ'য়ে যায়। এখানে আসবার আগেও আমি আঁচ করতে পারতুম তোমার মুখ দেখে—কোথায় যেন তোমার একটা দুঃখ আছে।'

গোলাপ কথা বলল না। প্রখরা সোনার স্নিগ্ধ চোখে সে তার সান্ত্বনার বাণী পাঠ করছিল।

'দাদা, এক কাজ কর না।'

'কী?'

'কিছু মনে কোরো না, দাদা। আমার বলবার কথা নয় এটা, তবু বলছি। তুমি কাকে বেশী ভালবাসো—? শুধু তাকে নিয়ে ভালো ক'রে ঘর করলেই পারো। এত লুকোচুরি ক'রে তুমি তো ভেতরে-ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছো। এমন ক'রে তুমি ক'দিন চালাবে? এই ক'মাসে তোমার কয়েক-বছর বয়স বেড়ে গেছে, মনে হয়।'

'জানি, এ লুকোচুরি বেশীদিন থাকবে না, সবকিছু বেরিয়ে একদিন পড়বেই। আজ বা কাল। কিন্তু—' যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল গোলাপের চোখে মুখে। 'কিন্তু তুই যত সহজ দেখছিস, ব্যাপারটা তা নয়। কাকে বেশী ভালবাসি—সে কি আমি নিজেই ছাই জানি? কারুর কোন দোষ নেই। বিনা দোষে একজনকে এতবড় শাস্তি দেব এ-কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়, সোনা। তার বাকী জীবনটার কথা ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি না আমি, মনের মধ্যে শুধু ছটফট করি। দোষ যতটুকু সে হয়তো আমারই সেইটাই তখন বড় ক'রে মনে হয়। সে-কথা যখন দুজনেই জানবে, আমায় কী ভাববে বল্ তো তারা? ভাববে, আমি দিনের পর দিন ঠকিয়েছি তাদের।'

গোলাপের কষ্ট হচ্ছে দেখে সোনা বলল, 'থাক দাদা, ও-কথা।'

'হ্যাঁ, থাক। আরো কি মুশকিল জানিস সোনা, কাউকে বুকটা খালি ক'রে সব কথা বলতে পারি না। কথা যত গোপন করা যায়, তত তার ওজন বাড়ে। সেই ওজন নিত্যি বাড়ছে আর আমার বুকে চেপে বসে আছে। আগে তবু মন খুলে কথা বলতে পারতুম এক বসন্তর সঙ্গে, এখন তাও পারি না। ও-যে সাগরকে বড্ডো ভালবাসে। সেই ভালবাসায় অন্ধ হ'য়ে আমায় ও আজকাল বোধহয় ঠিকমতো বুঝতে পারে না। অথচ সে-ই একদিন আমার বিয়েটা দিয়েছিল।'

সোনা বলল, 'দাদা, এবার আমার বহরমপুরে যাবার একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

'আমি যেতে পারলেই ভালো হ'ত। কিন্তু সাগরের এত শরীর খারাপ—আমার যাওয়া মুশকিল। বসন্ত, তুই বরং সোনাকে দিয়ে আয়।'

বসন্ত বিব্রত হ'য়ে বলল, 'আমি?'

সোনা বিকৃত মুখভঙ্গী ক'রে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি। ভয় নেই, খেয়ে ফেলব না। রাক্ষুসী নই।'

গোলাপ বলল, 'আঃ, তোদের যে কী হয়েছে, দুজনে দেখা হ'লেই খালি ঝগড়া করবি!'

সোনা বলল, 'দাদা, তুমি আমায় গাড়ীতে তুলে দিও, আমি একাই যেতে পারব।'

'না না, তা হয় না। বসন্ত যাবে। তুই যা পাগ্‌লা, হয়তো মাঝপথে নেমে ছুট দিলি।'

'যদি দৌড় দি', তাহলে কি আর তোমার ঐ বন্ধুটি ধরে রাখতে পারবে ?'

বসন্তকে অগত্যা রিক্সায় উঠতে হয়। পাশে সোনা।

ঠুনঠুন আওয়াজ রিক্সার ঘন্টিতে। কারুর মুখে কথা নেই।

বসন্ত বলল, 'তুমি সাগরকে বিম্লির কথা বলতে গেলে কেন ?'

'বেশ করেছি।'

এর পর আর কারুর কিছু বলবার থাকে না। রিক্সার ঝাঁকুনিতে দুটো দেহ বার বার তাদের সীমা লঙ্ঘন করতে থাকে।

স্টেশন।

'আমি মেয়েদের গাড়ীতে উঠছি।' সোনা গিয়ে লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে উঠল।

বসন্তকে অন্য কামরায় আলাদা উঠতে হ'ল।

মধ্যের একটা স্টেশনে খোঁজ নিয়েছিল বসন্ত।

সোনা বলে দিয়েছে, 'কিছু দরকার নেই। বারবার আসতে হবে না।'

বহরমপুরে গাড়ী থামতে মেয়েদের কামরাটার কাছে এল বসন্ত। কিন্তু সোনা নিখোঁজ। প্ল্যাটফর্মে সে নামেনি। কামরার ভেতরেও পাত্তা নেই। উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল বসন্ত। গেল কোথায় সোনা ?

ট্রেনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল বসন্ত। প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে খোঁজাখুঁজি করল। না, নেই।

ট্রেন ছেড়ে চলে গেল। প্ল্যাটফর্মটাও ফাঁকা হ'য়ে এসেছে।

ট্রেনে আসবার পথে কী কী করা সম্ভব সোনার পক্ষে, সব মাথায় ঘুরতে লাগল বসন্তর। দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠল। ট্রেন থেকে তাড়াতাড়ি নেমে, একা বাড়ী চলে যায়নি তো সোনা ? বসন্ত উর্ধ্বশ্বাসে পুর্ণদের বাড়ীতে পৌছল।

'সোনা কোথায় ? বাড়ী এসেছে ?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন বসন্তর।

'না।'

তবে মেয়েটার হল কী—গেল কোথায় ? সবাই চিন্তায় পড়ল। বিন্দু কেঁদে ফেলল। সবচেয়ে মারাত্মক চিন্তাটাই তার মনে আসছিল।

নিরু ভেবে বলল, 'সোনাদের এক মেসোমশাই থাকেন পলাশীতে। সেখানে যেতে পারে।'

ঠিক হ'ল পুর্ণ অফিসের পর যাবে পলাশীতে খোঁজ নিতে।

কিন্তু যেতে হ'ল না। সোনাদের মেসোমশাই স্বয়ং এসে খবর দিয়ে গেলেন, সোনা ওখানেই আছে।

বসন্তর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। অন্য সকলে গাল দিল সোনাকে।

মেসোমশাই জানিয়ে গেলেন, সোনা আজ আসতে চায় না বাড়ীতে, কাল আসবে।

বসন্ত ঠিক করল, একটা দিন অপেক্ষা করেই যাবে। কারণ, গোলাপকে জবাবদিহি করবার একটা ব্যাপার আছে। দায়িত্বটা পুরোপুরি পালন করেই যাবে।

রাতে বসন্তর হাতের কাছে আগের মতোই জলের গ্লাস রেখে দিল বিন্দু।

বসন্ত তাকাল বিন্দুর দিকে। একটু রোগা হ'য়েছে যেন সোনার আইবুড়ো মেজদি।

'কেমন আছো, বিন্দু?'

'ভালো।' বিষণ্ণভাবে হাসল বিন্দু। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি?'

'আমি তেমন ভালো নই।' বসন্তও একটু হাসল।

'কেন?'

'ছাখো-না, সোনা কি-একটা মুশকিলে ফেলল! গোলাপকে গিয়ে কী যে বলব!'

'সত্যি! সোনাটা যে কী! ওর কাজে আমারই লজ্জা হচ্ছে।'

'না। তোমার লজ্জা কী!'

'আমাদের এতসব খারাপ আপনি দেখে যাচ্ছেন, লজ্জা করবে না?' খুব মৃদুস্বরে বলল বিন্দু।

উঠে একটু এগিয়ে এল বসন্ত: 'কেন বিন্দু, আমি কি শুধু খারাপই দেখেছি? আমি তো ভালোও দেখেছি এ বাড়ীতে।'

বসন্তের গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে লাগল বিন্দুর বহু বছরের আইবুড়ো মন, বুকের স্পন্দন হ'ল দ্রুত।

ছুটে বেরিয়ে গেল বিন্দু। বসন্তর ঐ দৃষ্টির সামনে নিজর বেঢপ দেহটাকে রাখতে পারবে না সে। নিজের বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে সে অঝোরে কাঁদল।

সারা রাত ঘুম হ'ল না তার।

'এখন কেমন আছো সাগর?' জিজ্ঞেস করল গোলাপ।

'ভালো খুব ভালো। আমার কিছু হয়নি, শুধু একটু দুর্বল লাগছিল।'

গোলাপ সেই পাণ্ডুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সাগর বলল, 'আমার রোগ-শোক তুমি ভুলিয়ে দিয়েছ।'

ফিসফিস ক'রে বলল কথাগুলো—যেন অন্য কাউকে শুনতে দেবে না। চোখটা বুজল—যেন অনুভব ক'রে নিল তার রোগশোকহীন স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিটুকু। তারপর চোখ খুলে তাকাল গোলাপের দিকে। কত পরিচিত এই মুখ—এখন তার মধ্যে দুশ্চিন্তা-জটিল সূক্ষ্ম রেখার জাল।

সাগর বলল, 'তুমি কেন সারাদিন ঘরে বসে কাটাচ্ছো—একটা রোগা লোকের পাশে বসে? যাওনা, বরং একটু বেড়িয়ে এসো না বাইরে থেকে—ভালো লাগবে।'

'বাইরে বেরোতে আমার ইচ্ছে করে না আজকাল। তোমার পাশে বসে থাকতেই ভালো লাগে।'

'পাগল!' সস্নেহ স্বরে ছেলেমানুষকে বলার মতো ক'রে বলল সাগরী। কিন্তু তার বুক ভরে গিয়েছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল একি তবে তার জীবন থেকে একেবারে নিবে যাবার আগের উদ্দীপ্তি! 'কী হয়েছে আমার যে তুমি অমন ক'রে ভাবছ?'

গোলাপ কথা বলে না, সাগরীর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে।

সাগরী বলল, 'আমার কী মনে হয়, জানো?'

'কী?'

'যদি এখন মরে যেতে পারতুম—!'

'একি কথা, সাগর, তোমার মুখে! কেন, কেন তুমি মরে যেতে চাও?'

'এখন তুমি আমার কাছে রয়েছ। মেয়েরা তো সুখের মধ্যেই মরণ চায়।'

'সুখ আমি তো তোমায় দিতে পারিনি, সাগর!'

'অনেক দিয়েছ। তুমি জানো না। আজকাল আমার খুব পুরোনা কথা মনে পড়ে। ঐ মাঠটায় খোকন খেলা করত। এই ঘরে টিকলীটা মাথায় দিয়ে খোকন হেঁটে হেঁটে বেড়াত। রুনু-ঝুনু, ভবন-দাদু, ছোটবৌ, বসন্দা, সবার কথা মনে পড়ে। বিয়ের পর থেকেই এই ঘরেই তো আমরা দুজন। কম সুখ তো পাইনি জীবনে। যখন দিনগুলো গিয়েছে তখন বুঝিনি, আজ বুঝি।'

বহু পুরাতন দুটি নরনারী নব-দম্পতির মতো পরস্পরের হাত ধরে অনেকক্ষণ বসে রইল।

হঠাৎ একসময় গোলাপ বলল, 'বসন্তর তো ফেরার সময় হ'য়ে গেছে। এখনও ফিরছে না কেন বহরমপুর থেকে?'

সাগরী এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল—চমক ভাঙল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিল।

সোনা ফিরেছে বহরমপুর। বসন্তর কোলকাতা ফেরার সময় হ'য়েছে। বসন্তের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে সোনা সাগরী সম্পর্কে সব কথা বিম্‌লিকে বলবে। হয়তো বিম্‌লিকে উস্‌কে নিয়ে আসবে গোলাপ-সাগরীর দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে। বসন্ত ঠিক করল, সোনা বলবার আগে সে নিজেই বিম্‌লিকে বলবে, হাতে-পায়ে ধরে সে অনুরোধ জানাবে যেন বিম্‌লি সাগরীর ঘরটা না ভেঙে দেয়। বিপদ যখন নিশ্চিত আসন্ন সোনা মারফত, তখন শেষ একটা চেষ্টা ক'রে দেখবে সে।

বললও বসন্ত—কিছুমাত্র গোপন না ক'রে।

কিন্তু বসন্তর অনুরোধে বিক্ষুব্ধ বেদনায় ফেটে পড়ল বিম্‌লি : 'কেন আমি পরের ঘরের কথা ভাবব, কেন? কী পেয়েছি আমি সারা জীবনে যে অত ছেড়ে দেব? আমার নিজের ঘর যে ভাঙতে হবে তাহ'লে—না না, সে আমি কিছুতেই পারব না!'

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল বিম্‌লি বসন্তর ওপর। এখন আবার হঠাৎ ভেঙে পড়ল।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বসন্ত। এবার ফিরতে হবে কোলকাতা।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল বিন্দু। জিজ্ঞেস করল, 'আবার কবে আসবেন?'

'কবে আসব বলতে পারি না, বিন্দু। তবে আসব আমি।'

হঠাৎ সোনা এসে উপস্থিত। বসন্তর কথাটা শুনতে পেয়েছে সে। তার গলাটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে উঠল, 'আসবেই তো! না এসে যাবে কোথায়! ভাঙা বেড়া দেখলে শেয়াল তো লোভে-লোভেই আসবে।'

বিন্দু চীৎকার ক'রে তাকে থামাতে চেষ্টা করল : 'সোনা!'

বিন্দুর সামনে সংযত হবার মেয়ে সোনা নয়। সে বলল, 'আমায় ধমকাস না, মেজদি। আমি কিছু জানি না ভাবছিস?'

বিন্দু ছুটে চলে গেল সেখান থেকে।

বসন্ত ঠাট্টার সুরে বলল, 'তাহ'লে এবার আমি চলি, কচু-সোনা।'

সোনাও বিদ্রূপ করল—আগুনের গনগনে আঁচ সে-কথাগুলোর : 'আবার এসো যেন। অবিশ্যি মেজদির জন্যে।'

বসন্ত বলল, 'কেন কচু-সোনা, আমি তোমার জন্যেও আসতে পারি।'

হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল সোনা : 'কেন তুমি আমায় ঠাট্টা করবে ?'

তার তীব্র কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠল বসন্ত।

দ্রুত চলে গেল সোনা সেখান থেকে। বসন্তর সামনে সে চোখের জল ফেলবে না।

বসন্ত একটুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে।

কোলকাতায় ফিরে সাগরীকে একান্তে বলল বসন্ত, 'বিম্‌লিকে বললুম আমি অনেক ক'রে, কিন্তু সে মানতে চায় না।'

ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল সাগরী : 'এ তুমি কী করলে বসন্‌দা ?'

অসহায় ক্ষোভে কান্না আসছিল সাগরীর। বসন্ত যে বিম্‌লির কাছে সাগরীকে ছোট ক'রে দিয়ে এল। বিম্‌লির কাছে মাথা নোয়াতে চায় না সে। ভাই মারফত বোনই যে ব'লে পাঠায়নি তার প্রমাণ কোথায় বিম্‌লির কাছে!

'এ কাজ তুমি কেন করতে গেলে, বসন্‌দা, আমায় না জানিয়ে ?'

'পারলুম না আমি, সাগর! গিয়ে শুনলুম বিম্‌লির ছেলেপুলে হবে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল খোকনের কথা। সব বুদ্ধি আমার কেমন হ'য়ে গেল! বিম্‌লির কাছে তখনি গেলুম, না ব'লে পারলুম না তাকে।'

স্তব্ধ হ'য়ে গেল সাগরী। অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বসন্তর দিকে। সে-দৃষ্টির মধ্যে একটা অসীম শূন্যতা।

বসন্ত বলল, 'তা ছাড়া সোনা তো সব বলতোই।'

সাগরী শুনছিল না তার কথা—যদিও সে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল বসন্তরই দিকে। কাল তার গয়নার সঞ্চয় থেকে খোকনের টিকলীটা খোয়া গেছে। সাগরী মনে মনে বুঝেছিল, কে নিয়েছে। কিন্তু কিছু বলেনি। আজ সে নিঃসন্দেহ হ'ল। বুঝল, এবার তার কপাল পুড়েছে।

অস্থির হ'য়ে উঠেছিল বিম্‌লি।

'সোনা, কোলকাতা গিয়ে তুই উঠেছিলি কার বাড়ীতে—তোর দাদার বাড়ীতে ?'

'তা ছাড়া আর কোথায় উঠব!'

'কে কে ছিল রে বাড়ীতে ?'

'গৌর-নিতাই।'

'আর কেউ না?'

'না তো। কেন?'

বিম্‌লি সোনার হাতটা জড়িয়ে ধরল: 'ঠিক ক'রে বল, সোনা। আমায় লুকোস না।'

সোনার কষ্ট হচ্ছিল বিম্‌লির জন্যে; বহুবছর তারা এক সঙ্গে এক বাড়ীতে মানুষ হ'য়েছে। কিন্তু সে সত্যি-কথা বলতে পারবে না—সে যে কথা দিয়ে এসেছে গোলাপদাকে।

'বল্ সোনা, বল্! চুপ ক'রে থাকিস না! আমার কপাল কি ভেঙেছে?'

'এসব তুমি কি বলছ। আর কেউ ছিল না সে-বাড়ীতে।'

সোনা উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

বিম্‌লি স্থির হ'তে পারল না। ঠিক করল, কোলকাতা যাবে।

পূর্ণ বলল, 'তোমার যে চাকরীর ব্যবস্থা করলুম একটা, সেটার—'

'শীগ্‌গিরই ঘুরে আসব আমি।'

পূর্ণ আপত্তি করল না আর। কারুর দাম্পত্যজীবনের মধ্যে সে থাকতে চায় না। সে অবশ্য সব ব্যাপারটা জানে না, বিম্‌লি বলেনি কিছু—এ-কথা বলবার নয়। কিন্তু পূর্ণ ধরে নিয়েছে, এতদিন পরে সুরু হচ্ছে যে যৌথজীবন, তার নানা সমস্যা থাকবেই; সে-সমস্যার সমাধান যদি নিজেই করতে চায়, আপত্তি করবার কিছু নেই।

পূর্ণদের এক পারিবারিক বন্ধু, পূর্ণদের অফিসেই কাজ করে, সে যাচ্ছিল কোলকাতায়, তার সঙ্গে এসে বিম্‌লি প্রথমে ঠেকল বসন্তর দরজায়!

বিম্‌লিকে গোলাপের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না বসন্তর। নিয়তির পরিহাসটা বসন্ত লক্ষ্য করল; যে সাগরীকে রক্ষা করবার জন্যে বসন্তর এত চেষ্টা, আজ তার বাড়ীতে বিম্‌লিকে সে নিজেই নিয়ে যাচ্ছে।

গোলাপের দরজায় বিম্‌লিকে পৌঁছে দিয়ে বসন্ত চলে গেল, অর্থাৎ পালাল।

বিম্‌লিকে দেখে গোলাপের চেহারা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইল।

পায়ের শব্দে সাগরী জিজ্ঞেস করল, 'কে?' ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একজন

অপরিচিত ভদ্রমহিলা—কপালে সিঁদুর টকটক করছে। অপরিচিত, কিন্তু সাগরী চিনল তাকে। চেহারার বর্ণনা তার মোটামুটি শোনা ছিল, তা ছাড়া সহজ সংস্কারবশেই সে বিম্‌লিকে চিনল। স্পষ্ট ক'রে তাকাল তার দিকে, দেখল খুঁটিয়ে। তার সন্তান-সম্ভাবনার সকল চিহ্ন যতটুকু লক্ষ্য করা সম্ভব কিছুই চোখ এড়াল না সাগরীর।

বিম্‌লি হেসে বলল, 'আমায় চিনবে না, ভাই। তোমার স্বামী চিনবেন বোধহয়—ওঁর দেশের লোক আমি। ছোটবেলা থেকেই তোমার স্বামীকে চিনি। বসন্তবাবু আবার আমার স্বামীর বন্ধু—তোমার ভাই বসন্তবাবু। বসন্তবাবুর কাছেই একদিন শুনেছিলাম, ওর বোনের, মানে তোমার বিয়ে হয়েছে আমাদের এই দেশের লোকটির সঙ্গে।' গোলাপের দিকে তাকিয়ে বিম্‌লি হাসল। 'সেদিন থেকে ভাবছি, একবার আসব, দেশের লোকটিকেও দেখে যাব, তোমার সঙ্গেও আলাপ হবে। আজ চলে এলাম।'

বিম্‌লির অভিনয়ে হতভম্ব হ'য়ে গেল গোলাপ, আশ্চর্য হ'ল সাগরী। কিন্তু সাগরীও অভিনয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে না।

সাগরী প্রসন্ন হেসে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন।'

বিম্‌লি গোলাপের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, চিনতে পারছো?'

গোলাপ কোনরকমে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

বিম্‌লি হেসে বলল, 'ছোটবেলার বন্ধু আমি, তা অত জড়সড় কেন?'

সাগরী হালকা সুরে বলল, 'আপনার দেশের মানুষটি বড় লাজুক। আমি তো ভেবেই পাই না, এ লোক আবার হাজার মানুষের সামনে পালা গায় কি ক'রে।'

বিম্‌লি দুষ্টু হেসে বলল, 'বড্‌ডো লাজুক বুঝি? তাহ'লে বরং ওঁকে ছেড়ে আমরা চল ভেতরে রান্নাঘরের দিকে যাই, তোমার ঘর-সংসার দেখি।'

বিম্‌লি আর সাগরী গোলাপকে ছেড়ে এল। বিম্‌লি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সত্যি ঘর-সংসার দেখছিল।

সাগরী বলল, 'বসুন, একটু চা করি।'

বিম্‌লি বাধা দিল, 'থাক্ ভাই, আর একদিন এসে খাব। আজ একটু তাড়া আছে। বাড়ীটা চিনে গেলুম আজ বসন্তবাবুর সঙ্গে এসে। পরে আবার আসব। এই বুঝি মেয়ে?'

'হ্যাঁ, বড় মেয়ে।'

'কী নাম তোমার ?...রুনু ? বেশ ভালো নাম তো। আর তোমার নাম ? ঝুনু ? তোমার নাম তো আরো ভালো। এসো, এদিকে এসো তো লক্ষ্মীসোনা !'

বিম্‌লি দুজনকে বুকের কাছে টেনে নিল।

সাগরী বলল, 'নোংরা হ'য়ে রয়েছে ওরা, আপনার কাপড় নোংরা করবে।'

বিম্‌লি হেসে বলল, 'করুক, কেচে নেব।'

ঝুনু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে ?'

বিম্‌লি হেসে বলল, 'চিনতে পারছ না আমায় ? আমি তোমার মাসী।'

সাগরী বলে, 'ওর বাপের দেশের লোক যখন, তখন তো পিসী হবারই কথা।'

'কিন্তু ওর মার বোন যে।'

রুনু-ঝুনুকে বুকের কাছে চেপে ধরেছিল বিম্‌লি।

সাগরী বলল, 'আপনি বুঝি বাচ্ছা ছেলেমেয়ে খুব পছন্দ করেন ?'

'হ্যাঁ, খুব।'

এর পরেই সাগরীর সম্ভাব্য প্রশ্ন—'আপনার ক'টি ?'—এটা আন্দাজ ক'রে বিম্‌লি নিজেই বলল, 'তবু দেখুন না কপাল ! ষোলোবছর হ'তে চলল বিয়ে হয়েছে, ভগবান কোলে একটিও ঢ্যাননি।'

সাগরী ভোলেনি বিম্‌লির সন্তান-সম্ভাবনার কথা, সেই সঙ্গে খোকনের কথা। খোকন কি তাহ'লে তাকে ছেড়ে বিম্‌লির কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল ?

বিম্‌লি বলল, 'এবার উঠি, ভাই।'

'এরি মধ্যে উঠবেন ?'

'হ্যাঁ, আজ উঠি। পরে আসব না-হয়।'

ও-ঘরে এসে বিম্‌লি গোলাপকে বলল, 'বসন্তবাবুর তো পাত্তা নেই। একটু এগিয়ে দেবে নাকি ?'

'চল।'

সাগরী ও বিম্‌লি পরস্পরকে চিনেও সারাক্ষণ অভিনয় ক'রে গেল। আর আড়ষ্ট হ'য়ে রইল অভিনেতা গোলাপ।

গোলাপ বেরিয়ে যেতেই ভেঙে পড়ল সাগরী। দরজার পাল্লাটা সজোরে চেপে ধরে সে বৃথা নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে গোলাপের হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তাকে ; কিংবা

চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। কিন্তু বিম্‌লির সামনে কোনরকম দুর্বলতা সে দেখাতে পারবে না। এই যদি তার সঙ্গে গোলাপের শেষ দেখা হয়, তবু সহ্য করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, কেঁদে কোন ফল নেই। সারাজীবন কাঁদবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

যতক্ষণ দেখা যায়, সাগরী দরজাটা চেপে ধরে তাকিয়ে রইল। একটা প্রশ্ন অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে লাগল মনের মধ্যে—এই কি শেষ দেখা? চিরদিনের মতো কি চলে যাচ্ছে গোলাপ তার জীবন থেকে?

মোড়ে এসে বিম্‌লি বলল, 'একটা রিক্‌সা ডাকো।'

দুজনে উঠল একটা রিক্‌সায়।

বিম্‌লি বলল, 'সামনের পর্দা ফেলে দাও।'

চলমান বাসরে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসল দুজনে।

কিছুক্ষণ বাদে গোলাপ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায় বিম্‌লি?'

'স্টেশনে।' একটু থেমে যোগ করল বিম্‌লি, 'ঐ অব্দিই শুধু। তারপর আর যেতে বলব না।...তুমি সাগরকে খুব ভালবাস, না?' তার চোখের কোণে জল ভরে উঠল।

'আমি তোমাকেও ভালবাসি, বিমলা!'

কথাগুলোকে বুকের মধ্যে অনুভব ক'রে নেবার জন্য চোখ বুজল বিম্‌লি—জল গড়িয়ে এলো দুটো ধারায়।

গোলাপ পকেট থেকে টিকলীটা বার ক'রে দিল বিম্‌লির হাতে। বলল, 'আমাদের ছেলে হ'লে তাকে পরিয়ে দিও।'

বিম্‌লি বলল, 'আমি চাকরী পেয়েছি একটা।'

গোলাপের মনে পড়ল, বিম্‌লি চাকরী পেলে গোলাপকে নিয়ে এক জায়গায় ঘর বাঁধবে ঠিক করেছিল।

গোলাপ বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

বিম্‌লি করুণভাবে হাসল: 'কষ্ট—হ্যাঁ, তা হচ্ছে। তোমার কাছে মিথ্যে বলব কি করে?' দম যেন বন্ধ হ'য়ে এল তার। 'কিন্তু আমি তো তোমার ভালবাসা পেয়েছি। আর এই টিকলীটা যার জন্যে, তাকেও তো তুমিই দিয়েছ।'

গোলাপ বুকের কাছে চেপে ধরলো তাকে—এই শেষবারের মতো।

স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। বিম্‌লি উঠল মেয়েদের গাড়ীতে। বাইরে জানালায় দাঁড়াল গোলাপ।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। ধীরে। ক্রমে দ্রুত হ'ল গতি। বিম্‌লি জানালা দিয়ে মুখটা বার ক'রে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল!

গোলাপের চোখটা ঝাপসা হ'য়ে গেল। ট্রেনটা চলে যাবার পরও সে কিছুক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ী ফিরছিল গোলাপ। পথে শরতের সঙ্গে দেখা—সে চাকরীর খবর দিতে গোলাপের বাড়ীতে যাচ্ছিল। শরৎ চাকরীর কথা ব'লে চলে গেল।

এদিকে সাগরী দরজা ধরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। গোলাপের যত দেরী হচ্ছিল, তত সে বসে পড়ছিল। ভেতরের অস্থির তোলপাড়ে মনটা চুরমার হ'য়ে ক্রমে হতাশায় অসাড় হ'য়ে আসছিল।

হঠাৎ গোলাপ ছুটে এসে সাগরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে দুজনকে বুকের গভীরে টেনে আনল।

কাঁদছিল তারা। দুজনের চোখের জলে নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হ'ল তাদের।

খানিকক্ষণ পরে গোলাপ বলল, 'শরৎদের ওখানে চাকরী ঠিক হ'য়েছে। কালই ওখানে চলে যেতে হবে।'

'এ বাড়ী ছেড়ে— ?'

'হ্যাঁ।'

এ বাড়ীর সঙ্গে বহু স্মৃতি জড়িত। বিয়ের পরের সব ক'টা দিনই যে এখানে। ছোটবৌ টুকটুকে ছেলে নিয়ে ফিরে সাগররাণীকে আর দেখতে পাবে না। ভবন-দাদু বলবেন—'রাজবাড়ী যে খালি হ'য়ে যাবে, রাজা—খাঁ-খাঁ করবে!'

আর খোকন না-থেকেও যেন এ-বাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। এবার খোকন সত্যি ছেড়ে যাবে তাদের।

তবু এ-বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। এ ঠিকানা মুছে নতুন ঠিকানায় যাবে—নিরুদ্দেশ হ'য়ে মিশে থাকবে পৃথিবীর জন-সমুদ্রে, কেউ চেষ্টা করেও খুঁজে পাবে না।

মাঠের ইমারতটায় একঘেয়ে ক্লান্ত স্বরে ছাদ-পিটুনী মজুরানীরা গান গাইছে মুগুরের তালে-তালে। ঐ গান থেমে যাবে। নতুন মানুষ আসবে ঐ বাড়ীতে বসবাস করতে। আসবে নতুন দম্পতি, নতুন শিশু। এই

"রাজপ্রাসাদে'ও আসবে। কিন্তু সাগরী ও গোলাপ আর এখানে থাকবে না।

বিন্দুকে কথা দিয়েছিল বসন্ত, বলেছিল, 'ফিরে আসবে।' চিরজীবনের মতো মিথ্যে হয়ে গেল সে-কথা, ফিরতে পারল না বসন্ত। সে বিম্‌লিদের সঙ্গে গোলাপদের যোগসূত্র হ'তে চায় না। গোলাপকে বাদ দিলে সে একা এ পৃথিবীতে, যে দুটো ঠিকানা জানে।

সে যাত্রাদলের কাজ ছাড়েনি। পথে পথে ঘুরে সে মনের অনুভূতিটা ক্ষইয়ে দিতে চায়। শান্ত, করুণ দুটি চোখ আজও তার পথ চেয়ে আছে, সারাজীবন থাকবে, কিন্তু বসন্ত ফিরতে পারবে না। বিন্দু যেন ক্ষমা করে তাকে! সে দুটো পায়ে শুধু চলবে আর চলবে। স্থির দুটো চোখ, আর অস্থির দুটো পা। কোনদিন তারা মিলবে না!

কচু-সোনার কথাও মনে পড়ে বসন্তর। বড় জ্বালায় জ্বলছে মেয়েটা! সে যেন সুখ পায়, শান্তি পায়!